অষ্টাবিংশের সংহতি

২৮তম বিসিএস ফোরাম

EBL Securities Ltd.

A Subsidiary of Eastern Bank Ltd.

Quality | Reliability | Confidentiality

OUR SERVICES

Brokerage Services

CDBL Services

Margin Loan Facility

EBLSL App & Online Trading Facility

Foreign Trade

Equity Research

Electronic Trade Confirmation & Personalized Services

HEAD OFFICE:

Jiban Bima Bhaban (1st Floor), 10 Dilkusha C/A, Dhaka-1000, Tel: +88 02 47111935, 9553247, Fax: +88 02 47112944
E-mail: info@eblsecurities.com, Web: www.eblsecurities.com

৮ম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে

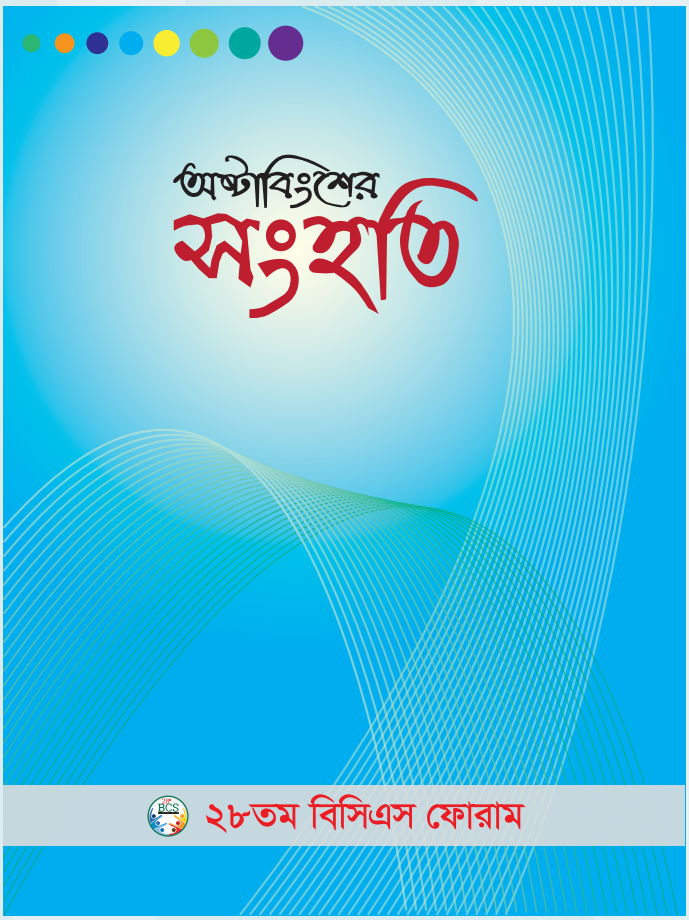

২য় সংখ্যা * ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

সম্পাদনা পর্ষদ

অষ্টাবিংশের সংহতি

সম্পাদনা উপদেষ্টা	:	**মোঃ কামরুল ইসলাম** সভাপতি, ২৮তম বিসিএস ফোরাম সৈয়দ ইফতেহার আলী সাধারণ সম্পাদক, ২৮তম বিসিএস ফোরাম
প্রধান সম্পাদক	:	**মোঃ নাজমুল আহসান মুরাদ (পিএইচডি)** সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক, ২৮তম বিসিএস ফোরাম ও সভাপতি, প্রকাশনা উপকমিটি
সদস্য সচিব	:	**ডা. মোঃ আব্দুল মুমিত সরকার** সহ-সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক, ২৮তম বিসিএস ফোরাম
সম্পাদনা সহযোগী	:	**মোঃ গালিব হোসেন** **মিনহাজুল ইসলাম জায়েদ** **রাজিব দাস** **মোহাম্মদ শাহ আলম** **তাপস কুমার চন্দ** **আবু সালেহ্ মুহাম্মদ নোমান** **ডা. মধুসূদন মন্ডল** **ডা. এম এ আউয়াল**
প্রকাশনায়	:	২৮তম বিসিএস ফোরাম E-mail: info@28bcs.org www.28bcs.org
প্রকাশকাল	:	১৬ মার্চ, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
ইভেন্ট পার্টনার	:	মাটি কমিউনিকেশন
প্রচ্ছদ, অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণ	:	কনফিডেন্স প্রিন্টার্স ৩১২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট (২য় তলা), কাটাবন, ঢাকা।

প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের প্রতি জাতির পিতার আহ্বান

সরকারি কর্মচারীগণ জনগণের সেবক

সমস্ত সরকারি কর্মচারীকেই আমি অনুরোধ করি, যাদের অর্থে আমাদের সংসার চলে, তাদের সেবা করুন। যাদের জন্য, যাদের অর্থে আজকে আমরা চলছি, তাদের যাতে কষ্ট না হয়, তার দিকে খেয়াল রাখুন। যারা অন্যায় করবে, আপনারা অবশ্যই তাদের কঠোর হস্তে দমন করবেন। কিন্তু সাবধান, একটা নিরাপদ লোকের উপরও যেন অত্যাচার না হয়। তাতে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠবে। আপনারা সেই দিকে খেয়াল রাখবেন। আপনারা যদি অত্যাচার করেন, শেষ পর্যন্ত আমাকেও আল্লাহর কাছে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। কারণ, আমি আপনাদের জাতির পিতা, আমি আপনাদের প্রধানমন্ত্রী, আমি আপনাদের নেতা। আমারও সেখানে দায়িত্ব রয়েছে। আপনাদের প্রত্যেকটি কাজের দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত আমার ঘাড়ে চাপে, আমার সহকর্মীদের ঘাড়ে চাপে। এজন্য আপনাদের কাছে আমার আবেদন রইল, আমার অনুরোধ রইল, আমার আদেশ রইল, আপনারা মানুষের সেবা করুন। মানুষের সেবার মতো শান্তি দুনিয়ায় আর কিছুতেই হয় না। একটা গরীব যদি হাত তুলে আপনাকে দোয়া করে, আল্লাহ সেটা কবুল করে নেন। এজন্য কোনো দিন যেন গরিব-দুঃখীর ওপর, কোনো দিন যারা অত্যাচার করেনি, তাদের ওপর অত্যাচার না হয়। যদি হয়, আমাদের স্বাধীনতা বৃথা হয়ে যাবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

জাতির স্মৃতিতে
তোমরা চির-ভাস্বর

মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর

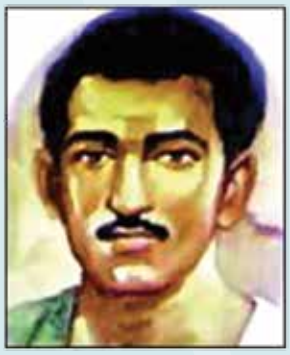

হামিদুর রহমান

মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল

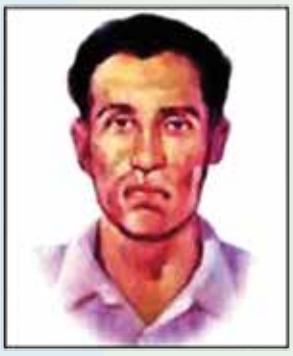

মোহাম্মদ রুহুল আমিন

মতিউর রহমান

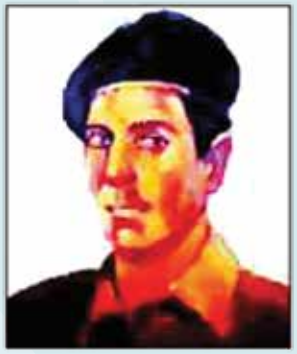

মুন্সি আব্দুর রউফ

নূর মোহাম্মদ শেখ

বাণী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

২ চৈত্র ১৪২৫
১৬ মার্চ ২০১৯

২৮তম বিসিএস ফোরামের ৮ম বর্ষপূর্তিতে ফোরামের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

দেশে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায়ে তা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের রয়েছে নিবিড় সংযোগ। ভিশন-২০২১ ও ভিশন-২০৪১ কে সামনে রেখে বর্তমান সরকার বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকারের এসব কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন এবং জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখতে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সদস্যবৃন্দকে সততা, দক্ষতা ও সর্বোপরি পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। তাই সিভিল সার্ভিসের প্রতিটি সদস্যকে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সব সময় জনস্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে। আমি আশা করি ২৮তম বিসিএস ফোরাম আন্তঃক্যাডার যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের কর্মপরিকল্পনা দ্রুততার সাথে বাস্তবায়ন ও একটি সুখী-সমৃদ্ধ, উন্নত বাংলাদেশ গঠনে অধিকতর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করবেন - জাতি তা প্রত্যাশা করে।

আমি ২৮তম বিসিএস ফোরামের সকল সদস্যদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আবদুল হামিদ

বাণী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২ চৈত্র ১৪২৫
১৬ মার্চ ২০১৯

২৮তম বিসিএস ফোরাম ১৬ই মার্চ ৮ম বর্ষপূর্তি উদযাপন করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি ২৮তম ব্যাচের সকল সদস্যকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আওয়ামী লীগ সরকার মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা আজ জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজগুলো বাস্তবায়ন করছি। গত ১০ বছরে আমরা দেশের প্রতিটি খাতে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করেছি। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে 'রোল মডেল'।

আমরা একটি দক্ষ, কার্যকর এবং গতিশীল সিভিল সার্ভিস সৃষ্টিতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। আমরা সরকারি অফিসে সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন করেছি। দেশের সকল ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ, দপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের প্রায় ২৫ হাজার ওয়েবসাইট নিয়ে আমরা 'জাতীয় তথ্য বাতায়ন' চালু করেছি। এর ফলে তথ্যপ্রাপ্তির সকল সুযোগ-সুবিধা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে। আমরা সরকারি কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা বহুগুণে বাড়িয়েছি। ৮ম পে-স্কেলের মাধ্যমে ১২৩ ভাগ পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধি করেছি। সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের জন্য বিদেশে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। 'জনপ্রশাসন পদক' প্রদানের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীদের উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। আমাদের সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে সিভিল সার্ভিসের সামর্থ্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

সদ্য সমাপ্ত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণ বাংলাদেশ আওয়ামীলীগকে বিপুলভাবে বিজয়ী করেছে। আমাদের ওপর দেশের মানুষ যে দৃঢ় আস্থা রেখেছে, আমরা তার পরিপূর্ণ মূল্যায়ন করব। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের আগেই উন্নত দেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ। আমি আশা করি, ২৮তম বিসিএস-এর সদস্যবৃন্দ দেশপ্রেম, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে জাতির পিতার ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন।

আমি ৮ম বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

বাণী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রতিমন্ত্রী
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২ চৈত্র ১৪২৫
১৬ মার্চ ২০১৯

২৮তম বিসিএস ক্যাডারের কর্মকর্তাবৃন্দ '২৮তম বিসিএস ফোরাম' নামে একটি সংগঠন তৈরি করেছেন জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ফোরামের সকল সদস্যকে জানাই অভিনন্দন। ২৮তম বিসিএস ফোরাম তাদের ৮ম বর্ষপূর্তিতে 'অষ্টাবিংশের সংহতি' নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। আমি আন্তরিকভাবে তাদের এ প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই।

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে ক্যাডার সার্ভিসের অবস্থান যেখানে শুধুমাত্র সৎ, মেধাবী এবং দক্ষরাই নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের কর্মদক্ষতার মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন।

রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, গ্রহণ করেছে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও প্রকল্প। সরকারি কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুরূপে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সরকারের বিভিন্ন বিভাগসমূহের মাঝে সুষ্ঠু সমন্বয় ও সহযোগিতা। এজন্য আন্তঃক্যাডার যোগাযোগ, সহযোগিতা ও সম্প্রীতির কোনো বিকল্প নেই। এ সংগঠনের মাধ্যমে ক্যাডারের সদস্যবৃন্দের মাঝে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি স্মরণিকাটির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং প্রকাশনাটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ফরহাদ হোসেন, এমপি

বাণী

সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

২ চৈত্র ১৪২৫
১৬ মার্চ ২০১৯

২৮তম বিসিএস ফোরাম বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে 'অষ্টাবিংশের সংহতি' নামে স্মরণিকা প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি ২৮তম বিসিএস ফোরামের সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানাই এবং স্মরণিকা প্রকাশের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

লক্ষ লক্ষ প্রার্থীদের সাথে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অধিকতর মেধাবী ও দক্ষরাই বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে যোগদান করার সুযোগ পেয়ে থাকেন। ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের কর্মদক্ষতার মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় ও 'ভিশন-২০২১' সফলভাবে বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, গ্রহণ করেছে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও প্রকল্প। তবে সরকারের এ উদ্যোগ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগসমূহের মাঝে সুষ্ঠু সমন্বয় ও সহযোগিতা প্রয়োজন। এ জন্য সিভিল সার্ভিসের ক্যাডারসমূহের মধ্যে যোগাযোগ, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতির কোনো বিকল্প নেই। ২৮তম বিসিএস ফোরাম ৮ম বর্ষপূর্তি উদযাপনের মাধ্যমে আন্তঃক্যাডার সহযোগিতা ও পারস্পরিক সম্প্রীতি আরও বৃদ্ধি পাবে, পাশাপাশি সরকারের কর্মপরিকল্পনাকে সফলভাবে বাস্তবায়নে আগামী দিনগুলোতে অধিকতর অবদান রাখবে বলে প্রত্যাশা রাখি।

২৮তম বিসিএস ফোরামের উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি।

ফয়েজ আহম্মদ

বাণী

بسم الله الرحمن الرحيم

সভাপতি
২৮তম বিসিএস ফোরাম

‘২৮তম বিসিএস ফোরাম’ ২৮তম ব্যাচের ২৬টি ক্যাডারের দুই হাজারের বেশি সদস্যের পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন, ব্যক্তিগত সম্পর্ক উন্নয়ন, পেশাগত অভিজ্ঞতা বিনিময় আর আন্তঃক্যাডার সম্পর্ক উন্নয়নের উৎকৃষ্ট একটি স্থান। প্রতিটি সদস্যের ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিক কল্যাণে এই ফোরাম প্রতিনিয়ত সচেষ্ট আছে এবং ভবিষ্যতেও এই সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

২০১৭ সালের ০৫ আগস্ট প্রতিটি ক্যাডার থেকে প্রত্যক্ষ মতামত প্রদানের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রথম কমিটি একই বছরের ২৫ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করে। দায়িত্ব গ্রহণের পর কমিটির পক্ষ হতে ফোরামের নামে ব্যাংক হিসাব খোলা, আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৭ম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান, সৃজনশীল কাজের অংশ হিসেবে তথ্যসমৃদ্ধ স্মরণিকা ‘অষ্টাবিংশের সংহতি’র ১ম সংখ্যা প্রকাশ, শীতকালীন পিঠা উৎসবের আয়োজন, জাঁকজমকপূর্ণভাবে বাংলা নববর্ষ উদযাপন, ব্যাপক উপস্থিতি নিয়ে রমজানে ইফতার মাহফিলের আয়োজন সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। ফোরামের সদস্যদের ভবিষ্যৎ কল্যাণ বিবেচনায় ‘২৮তম বিসিএস অফিসার্স সমবায় সমিতি লিঃ’ নামে একটি সমিতি চালু করে এর রেজিস্ট্রেশনসহ অন্যান্য কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পন্ন করা হয়েছে।

এবার ৮ম বর্ষপূর্তি আর ৯ম বর্ষবরণ উপলক্ষে নতুন একগুচ্ছ কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। এর মাঝে বনভোজন আয়োজন, স্মরণিকার ২য় সংখ্যা প্রকাশ, সকল ক্যাডারের সকল সদস্যের তথ্যসমৃদ্ধ মোবাইল অ্যাপস তৈরি ইত্যাদি।

ভবিষ্যতের জন্য নতুন একগুচ্ছ পরিকল্পনা আমাদের হাতে রয়েছে। এর মাঝে আছে অফিসারদের কল্যাণে ‘২৮তম বিসিএস অফিসার্স ফাউন্ডেশন’ প্রতিষ্ঠা, ফোরামের জন্য অফিসের ব্যবস্থা করা, বিভাগীয় পর্যায়ে কমিটি গঠন, ‘২০০ জন ২০০ কাঠা’ প্রকল্প গ্রহণ, সমিতির সদস্যদের জন্য ‘গ্রুপ বিমা’-র কার্যক্রম গ্রহণ, সমিতির জন্য উপযুক্ত সফট্ওয়্যার তৈরি ইত্যাদি।

আশা করছি সকল সদস্যের তথ্যসমৃদ্ধ ‘মোবাইল অ্যাপস ডিরেকটরী’ সবার কাছে আকর্ষণীয় হবে, সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় জিন্দা পার্কের বনভোজন সুন্দরভাবে সম্পন্ন হবে আর ‘অষ্টাবিংশের সংহতি’র দ্বিতীয় সংখ্যাটি সুন্দর আর সুখপাঠ্য হবে। প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

৮ম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত সকল প্রচেষ্টা সফল হোক, এই কামনায়।

মোঃ কামরুল ইসলাম
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, বাংলাদেশ পুলিশ।
ও
সভাপতি, ২৮তম বিসিএস ফোরাম।

বাণী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সাধারণ সম্পাদক
২৮তম বিসিএস ফোরাম

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) এর ২৮তম ব্যাচের ২৬টি ক্যাডারে যোগদানকৃত প্রায় ২,২০০ সদস্যের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন, আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রয়াস আমাদের ২৮তম বিসিএস ফোরাম। এ ব্যাচের বিভিন্ন ক্যাডারে স্বতন্ত্র ফোরাম বা সংগঠন থাকলেও আমরা সবাই মিলে একটি ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্মে নানা বাস্তবতায় একত্রিত হতে পারিনি। দীর্ঘদিন পরে হলেও সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমিতে ৬ষ্ঠ বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্যে দিয়ে আমাদের মাঝে সৌহার্দ্য ভ্রাতৃত্ব আর পারস্পরিক সহমর্মিতার এক মেলবন্ধনের সূচনা হয়। ২৮তম বিসিএস ফোরাম এর গতিশীলতা আনয়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং এর ফলশ্রুতিতে একটি কার্যকর কমিটি গঠিত হয়।

পরবর্তীতে গত ০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ সালে অত্র ফোরামের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করি। দায়িত্বভার গ্রহণের পরই আমরা ৭ম বর্ষপূতি অনুষ্ঠান পুলিশ কনভেনশন হলে আয়োজন করি। এছাড়াও ইফতার মাহফিল, পিঠা উৎসব, বিভিন্ন জাতীয় ও রাীয় দিবস পালনের পাশাপাশি ২৮তম বিসিএস ফোরামের সদস্যদের ভবিষ্যৎ কল্যাণকে মাথায় রেখে ২৮তম বিসিএস অফিসার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড এর রুপরেখা তৈরি করা হয় এবং একাধিক মিটিং এর মাধ্যমে এর চূড়ান্ত গঠনতন্ত্র তৈরি করা হয়। সমবায় অধিদপ্তর থেকে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ২৮তম বিসিএস অফিসার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড নামে একটি সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ২৮তম বিসিএস অফিসার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড এর মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ করে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানোই আমাদের উদ্দেশ্য।

আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন, ২৮তম বিসিএস ফোরামের **28bcs.org** নামে ওয়েবসাইটটির পাশাপাশি এন্ড্রয়েড অ্যাপসটি তৈরি সম্পন্ন হয়েছে যা ১৬ মার্চ ২০১৯ রাজেন্দ্রপুর ইকো রিসোর্টে এন্ড ভিলেজে অনুষ্ঠিত ৮ম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন ও নবম বর্ষে পদার্পন অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করা হবে। এই অ্যাপসটির মাধ্যমে আমাদের পারস্পরিক যোগাযোগ আরও সহজতর হবে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে গতিশীলতা আসবে। ওয়েবসাইট ও এন্ড্রয়েড অ্যাপসটিতে আপনাদের তথ্য দ্রুত হালনাগাদ করার জন্য অনুরোধ করছি। তাছাড়াও ২৮তম বিসিএস অফিসার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড এর জন্য একটি অ্যাপস তৈরির প্রক্রিয়া চলমান যার মাধ্যমে সদস্যরা নিজেরাই তাদের হিসাব বিবরণি সহজেই দেখতে পারবেন।

আমাদের এ ফোরামের মাধ্যমে ২৮তম বিসিএস ফোরামের সকল ক্যাডারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা প্রতিনিয়ত জোরদার হচ্ছে। আমরা অসুস্থ সদস্যদের প্রতি যৌথভাবে আর্থিক ও আত্মিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছি যা ভবিষ্যতে আরও বেগবান হবে ইনশা আল্লাহ। ২৮তম বিসিএস ফোরামের সদস্যদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত একটি অলাভজনক কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। যার মাধ্যমে সদস্যদের বিভিন্ন ধরনের আপদকালীন প্রয়োজন দ্রুততার সাথে সমাধান করা সম্ভব হবে। **২৮তম বিসিএস কল্যাণ ফাউন্ডেশন** নামে কল্যাণমুখী সংগঠনটির রূপরেখা ইতোমধ্যে খসড়া তৈরি করা হয়েছে যা আগামী ৮ম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে সকলের সাথে আলোচনা ও মতামত গ্রহণের ভিত্তিতে চূড়ান্ত করা হবে।

গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পরবর্তী কমিটি গঠনের জন্য আমরা বদ্ধপরিকর। নির্বাচনের মাধ্যমেই অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিনিধিত্বমূলক দক্ষ ও কর্মঠ নেতৃত্ব বাছাই করা । যারা ২৮তম বিসিএস ফোরামকে নিয়ে যাবে অনন্য উচ্চতায় । এব্যাপারে সকলে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে নেতৃত্ব বাছাইয়ের কাজটি বর্তমান কমিটির জন্য সহজসাধ্য করবেন বলে আশা রাখব। এ ব্যাপারেও ২৮তম বিসিএস ফোরাম সকলের কাছে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় হয়ে থাকবে ইনশা আল্লাহ।

দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে দেশের প্রতিটি প্রান্তে ২৮তম বিসিএস ফোরামের বিভিন্ন ক্যাডারের সদস্যরা সততা ও সুনামের সাথে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সম্পন্ন করে চলছে। যার ফলে প্রতিটি বিভাগেই আমরা একটি পজিটিভ ইমেজ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি। দেশের জনসমষ্ঠির মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং 'ভিশন ২০২১' ও 'ভিশন ২০৪১' বাস্তবায়নে ২৮তম বিসিএস কর্মকর্তাগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবেন।

স্মরণিকা প্রকাশের মত অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ এই কাজ করতে যারা নিরলস পরিশ্রম করেছেন, বিশেষ করে সম্পাদনা পরিষদ ও প্রকাশনা উপ-কমিটির সকল সদস্যকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

২৮তম বিসিএস ফোরামের যেসকল সম্মানিত সদস্য আমাদেরকে ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে গেছেন তাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি এবং তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

পরিশেষে, আমাকে ২৮ বিসিএস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করার মাধ্যমে আপনাদের সেবা করার সুযোগ দেয়ায় সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সৈয়দ ইফতেহার আলী
বিসিএস (আনসার)
জেলা কমান্ডেন্ট নোয়াখালী,
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

সম্পাদকীয়

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

২৮তম বিসিএস-এর ৮ম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশ হতে যাচ্ছে স্মরণিকা 'অষ্টাবিংশের সংহতি'র ২য় সংখ্যা যা ২৮তম বিসিএস ফোরামের সদস্যদের সৃজনশীলতা বিকাশের পাশাপাশি আন্তঃক্যাডার সম্প্রীতি জোরদার ও সেবার মান বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা রাখি। বর্তমান যুগ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগ। বলা হয়ে থাকে, 'Communication is money' সে প্রেক্ষাপটে 'অষ্টাবিংশের সংহতি' ফোরামের সদস্যদের পেশাদারিত্ব, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ক্ষেত্র রচনা করবে এবং অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনকে সহজতর করবে।

'অষ্টাবিংশের সংহতি' ২য় সংখ্যা প্রকাশ ২৮তম বিসিএস ফোরামের ৮ম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপনকে আরও স্মরণীয় করে রাখবে। স্মরণিকার ১ম সংখ্যার ন্যায় ২য় সংখ্যাও সম্পাদনা করতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। একই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সম্পাদনা পর্ষদের সকল সদস্যের প্রতি যাদের সহযোগিতায় 'অষ্টাবিংশের সংহতি'র ২য় সংখ্যা আলোর মুখ দেখছে। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ফোরাম সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ ইফতেহার আলী, মোঃ গালিব হোসেন, মোঃ শাহ আলম, মিনহাজুল ইসলাম জায়েদ, রাজিব দাস, আবু সালেহ্ মুহাম্মদ নোমানসহ অন্যান্য সহকর্মীদের প্রতি যাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সর্বাত্মক সহযোগিতা ব্যতীত স্মরণিকা প্রকাশ সম্ভব হতো না।

ফোরামের সদস্যবৃন্দ যারা কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, রম্য রচনা, ভ্রমণকাহিনি ও তথ্যসমৃদ্ধ লেখা দিয়ে স্মরণিকাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর্থিক সহায়তা দানের জন্য সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতা ও অনুদান প্রদানকারী সকল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে স্মরণিকা প্রকাশ করায় কিছু ভুলত্রুটি থাকতে পারে, এজন্য ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি এবং গঠনমূলক পরামর্শ আহ্বান করছি।

আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ২৮তম বিসিএস ফোরামের ৮ম বর্ষপূর্তি ও স্মরণিকা প্রকাশ উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, জনপ্রশাসন সচিব ফয়েজ আহম্মদ এর প্রতি যাঁদের মূল্যবান বাণী স্মরণিকাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসেবে আমাদেরকে অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করেছে।

'অষ্টাবিংশের সংহতি' ফোরামের সকল সদস্যের মাঝে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে একইসাথে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে বিশ্বাস করি। ২৮তম বিসিএস ফোরামের সকল সদস্যের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করছি।

মোঃ নাজমুল আহসান মুরাদ, পিএইচডি
বিসিএস (শিক্ষা)
সহকারী অধ্যাপক (দর্শন)
গবেষণা কর্মকর্তা, মাউশি অধিদপ্তর
ও
সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক, ২৮তম বিসিএস ফোরাম

যাদের হারিয়েছি

ডা. মোঃ রাশেদুল ইসলাম রাসেল
বিসিএস (স্বাস্থ্য)
ডা. মোঃ রাশেদুল ইসলাম রাসেল ২০০৫ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস সম্পন্ন করেন। ২৮তম বিসিএসে উত্তীর্ণ হয়ে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার অফিসার হিসেবে সহকারী সার্জন পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ১ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর উপজেলার রহনপুর ইউনিয়নে যোগদান করেন। ১০ মার্চ ২০১১ তারিখ সকালে নিজ জেলা রাজশাহী থেকে কর্মস্থলে যাওয়ার সময় রাজশাহী-চাপাই মহাসড়কে তাকে বহনকারী অটোর সাথে এক বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই তিনি মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

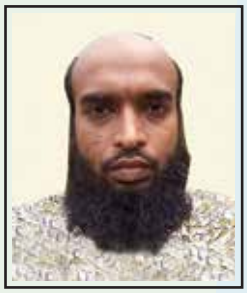

মোঃ রবিউল ইসলাম
বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)
মোঃ রবিউল ইসলাম ১২ ডিসেম্বর ১৯৮২ সালে নঁওগা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ২৮তম বিসিএস পরীক্ষয় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার অফিসার হিসেবে রাজশাহী সরকারি কলেজে প্রভাষক পদে ১ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে যোগদান করেন। দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ১ ডিসেম্বর ২০১৬ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

আ স ম মেহেদি হাসান
বিসিএস (কর)
আ স ম মেহেদি হাসান ১২ ডিসেম্বর ১৯৮২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর ২৮তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কর ক্যাডারে সহকারী কমিশনার হিসেবে ১ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে যোগদান করেন। তিনি মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে ১৫ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন।
আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

মোঃ শফিকুল ইসলাম
বিসিএস (প্রশাসন)
মোঃ শফিকুল ইসলাম ২৮তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রশাসন ক্যাডারে সহকারী কমিশনার হিসেবে ১ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে যোগদান করেন। তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় ১ জুলাই ২০১৮ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।
আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

কমিটি

সভাপতি
জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম
বিসিএস (পুলিশ)
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার
বাংলাদেশ পুলিশ

সহ-সভাপতি
ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আহসান হাবীব
বিসিএস (গণপূর্ত)
নির্বাহী প্রকৌশলী,
গণপূর্ত বিভাগ, নড়াইল

সহ-সভাপতি
খন্দকার মুহাম্মদ রাশেদ ইফতেখার
বিসিএস (কৃষি)
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা
কন্ট্রোলরুম, খামারবাড়ি, ঢাকা

সহ-সভাপতি
নাজমুন নাহার
বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)
সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
সরকারি এম ডব্লিউ কলেজ, নারায়ণগঞ্জ

সহ-সভাপতি
মোঃ শরীফ মাহমুদ
বিসিএস (তথ্য)
জনসংযোগ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সাধারণ সম্পাদক
সৈয়দ ইফতেহার আলী
বিসিএস (আনসার)
জেলা কমান্ডেন্ট, নোয়াখালী

যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক
ডা. মধুসূদন মন্ডল
বিসিএস (স্বাস্থ্য)
এমএস কোর্স (ইউরোলজি)
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক
মিনহাজুল ইসলাম জায়েদ
বিসিএস (ইকনমিক)
সিনিয়র সহকারী প্রধান, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক
শাহেন শাহ মাহমুদ
বিসিএস (পুলিশ)
অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার
ডিএমপি (উত্তরা জোন), ঢাকা

যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক
ইঞ্জিনিয়ার হায়দার কামরুজ্জামান
বিসিএস (সওজ)

যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক
ডা. নিতীশ কৃষ্ণ দাস
বিসিএস (স্বাস্থ্য-ডেন্টাল)
জুনিয়র কনসাল্‌টেন্ট (ডেন্টিস্ট্রি), শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা

সাংগঠনিক সম্পাদক
মোঃ গালিব হোসেন
বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)
সহকারী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান বিভাগ
সরকারি তিতুমীর কলেজ, ঢাকা

সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক
ডা. এম আশিক আওয়াল
বিসিএস (স্বাস্থ্য-ডেন্টাল) ওএসডি
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা

কোষাধ্যক্ষ
তাপস কুমার চন্দ
বিসিএস (কর)
উপ-কর কমিশনার
কর অঞ্চল-৪, ঢাকা

সহ-কোষাধ্যক্ষ
রাজিব দাস
বিসিএস (পুলিশ)
এডিসি, ডিএমপি, প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

দপ্তর সম্পাদক
ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আবিল আয়াম
বিসিএস (গণপূর্ত)
নির্বাহী প্রকৌশলী,
গণপূর্ত বিভাগ, সুনামগঞ্জ

সহ-দপ্তর সম্পাদক
মোঃ আব্দুল কাদের খান
বিসিএস (খাদ্য)
উপ-খাদ্য নিয়ন্ত্রক, পাবনা

প্রচার সম্পাদক
মোঃ আমিরুল ইসলাম
বিসিএস (পুলিশ)
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার,
পুলিশ হেডকোয়ার্টার, ঢাকা

সহ-প্রচার সম্পাদক
আব্দুল্লাহ শিবলী সাদিক
বিসিএস (তথ্য)
জনসংযোগ কর্মকর্তা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক
ইঞ্জিনিয়ার মোঃ রাজিবুল ইসলাম
বিসিএস (গণপূর্ত)
নির্বাহী প্রকৌশলী
গণপূর্ত বিভাগ, পঞ্চগড়

সহ-তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক
মোঃ আব্দুল মান্নান
বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা)

শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক
সরকার মোহাম্মদ খায়রুল আলম
বিসিএস (হিসাব ও নিরীক্ষা)
উপ-পরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প
অডিট অধিদপ্তর

সহ-শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক
মোঃ কামরুল হাসান
বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান
ঝালকাঠি সরকারি কলেজ

সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক
মোঃ নাজমুল আহসান মুরাদ, পিএইচডি
বিসিএস (শিক্ষা)
সহকারী অধ্যাপক (দর্শন)
গবেষণা কর্মকর্তা, মাউশি অধিদপ্তর

সহ-সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক
ডা. মোঃ আব্দুল মুমিত সরকার
বিসিএস (স্বাস্থ্য)
সহকারী রেজিস্ট্রার (মেডিসিন)
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

সাংস্কৃতিক সম্পাদক
মোঃ হুমায়ুন কবীর
বিসিএস (কৃষি)
প্রকল্প পরিচালক, ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা

সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক
মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ
বিসিএস (ডাক)
সহকারী পোস্টমাস্টার জেনারেল
ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা

ক্রীড়া সম্পাদক
সাইয়ীদ ফাহ্‌দ আল করিম
বিসিএস (কর)
উপ-কর কমিশনার
দ্বিতীয় সচিব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

সমাজকল্যাণ সম্পাদক
ডা. যাকিয়া সুলতানা নীলা
বিসিএস (স্বাস্থ্য)
মেডিকেল অফিসার
জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা

সহ-সমাজকল্যাণ সম্পাদক
মোঃ আশরাফুল ইসলাম
বিসিএস (সমবায়)
উপ-নিবন্ধক (প্রশাসন)
বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, রাজশাহী

আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক
তাহ্‌লীল দেলাওয়ার মুন
বিসিএস (পররাষ্ট্র)
সিনিয়র সহকারী সচিব
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক
মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম
বিসিএস (কাস্টমস)
উপ-কমিশনার কাস্টমস, এক্সসাইজ এন্ড ভ্যাট, লালবাগ ডিভিশন, ঢাকা

আইন বিষয়ক সম্পাদক
ডা. রাহাতুন নাঈম ম্যাগলিন
বিসিএস (স্বাস্থ্য)
জুনিয়র কনসালটেন্ট
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্স এন্ড হসপিটাল, ঢাকা

স্বাস্থ্য সম্পাদক
ডা. মোঃ জহিরুল ইসলাম
বিসিএস (স্বাস্থ্য)
রেসিডেন্ট, নাক কান গলা ও হেড নেক সার্জারি বিভাগ, ঢামেক হাসপাতাল

সহ-স্বাস্থ্য সম্পাদক
ডা. মোঃ শাহরিন তরফদার
বিসিএস (স্বাস্থ্য-ডেন্টাল)
জুনিয়র কনসালটেন্ট (ডেন্টিস্ট্রি)
কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল

প্রকৌশল বিষয়ক সম্পাদক
ইঞ্জিনিয়ার মোঃ রেজাউল করিম
বিসিএস (রেলওয়ে)
বিভাগীয় যান্ত্রিক প্রকৌশলী, লোকো,
বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম

সহ-প্রকৌশল বিষয়ক সম্পাদক
ইঞ্জিনিয়ার মোঃ তানভীর হোসেন
বিসিএস (সড়ক ও জনপথ)
উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী,
বাংলাদেশ সড়ক গবেষণাগার, ঢাকা

কৃষি বিষয়ক সম্পাদক
মুহাম্মদ বদরুল আলম শাহীন
বিসিএস (মৎস্য)
সহকারী প্রকল্প পরিচালক, সাসটেইনেবল
কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা

সহ-কৃষি বিষয়ক সম্পাদক
মোঃ বশিরুল-আল-মামুন
বিসিএস (বন)
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগ, খুলনা

নির্বাহী সদস্য
রাজিব হোসেন
বিসিএস (আনসার)
উপ-পরিচালক (মনিটরিং), বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম
প্রতিরক্ষা বাহিনী, সদরদপ্তর, ঢাকা

নির্বাহী সদস্য
ডা. মোঃ হাবিবুল্লাহ ফুয়াদ
বিসিএস (স্বাস্থ্য)
ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা

নির্বাহী সদস্য
শরফুদ্দিন মুহাঃ আবু ইউসুফ
বিসিএস (শিক্ষা)
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
সহঃ প্রকল্প পরিচালক, মাউশি অধিদপ্তর

নির্বাহী সদস্য
নাজমুন নাহার
অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার
(ট্রাফিক-পূর্ব) ডিএমপি, ঢাকা
ডিএমপি, ঢাকা

নির্বাহী সদস্য
ইঞ্জিনিয়ার এ ইচ এম খালেকুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী, গবেষণা ও উন্নয়ন
বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

নির্বাহী সদস্য
আব্দুর রহিম
বিসিএস (বাণিজ্য)
উপ-নিয়ন্ত্রক
আমদানি ও রপ্তানি যুগ্ম-নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, খুলনা

নির্বাহী সদস্য
আমিনুর ইসলাম
বিসিএস (কৃষি)
অতিরিক্ত উপ-পরিচালক, প্ল্যান্ট প্রোটেকশন উইং
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা ।

নির্বাহী সদস্য
মোঃ আশরাফুজ্জামান ভূঁইয়া
বিসিএস (ইকনমিক)
উপ-পরিচালক, আইএমইডি

নির্বাহী সদস্য
সাইফুল ইসলাম
বিসিএস (মৎস্য)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার
মানিকগঞ্জ সদর

নির্বাহী সদস্য
মোঃ মোকছেদ হোসেন
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ বেতার
বান্দরবান

নির্বাহী সদস্য
মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম
বিসিএস (কাস্টমস)
যুগ্ম কমিশনার, ঢাকা দক্ষিণ কমিশনারেট

নির্বাহী সদস্য
এ কে এম শামসুজ্জামান
বিসিএস (কর)
উপ-কর কমিশনার, সদর দপ্তর (প্রশাসন)
নারায়ণগঞ্জ

এক নজরে ২৮

২৮তম বিসিএস - লিপিবদ্ধ দিনপঞ্জী

২৮তম বিসিএস পরীক্ষার প্রথম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ থেকে শুরু করে কর্মকর্তাদের কর্মস্থলে যোগদানের মাঝে পার হতে হয়েছে অনেকগুলো ধাপ, কেটেছে অনেকগুলো দিন, হয়েছে অনেক ঘটনার ঘনঘটা। ফিরে দেখা যাক জ্বলজ্বল করা সেসব উজ্জ্বল দিন।

২৩/০১/২০০৮ - ২৮তম বিসিএস পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ;

২৮/১১/২০০৮ - প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত - মোট ১২০৯৪৬ জন আবেদনকারী;

০১/০২/২০০৯ - প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ - ১১৭৮৮ জন প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত;

৩০/০৩/২০০৯ - লিখিত পরীক্ষার সময়সূচী প্রকাশ;

১৫/০৪/২০০৯ - লিখিত পরীক্ষার সকল কেন্দ্রের হলো ও আসন ব্যবস্থা প্রকাশ;

৩০/০৪/২০০৯ থেকে ১২/০৫/২০০৯ - আবশ্যিক বিষয়সমূহে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত;

২৪/০৫/২০০৯ থেকে ০২/০৬/২০০৯ - পদ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত;

০২/০৯/২০০৯ - লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ - ৫৮৮১ জন উত্তীর্ণ;

০৮/০৯/২০০৯ থেকে - মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচী প্রকাশ;

০৪/১০/২০০৯ থেকে ১০/০১/২০১০ - মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত;

০৩/০৬/২০১০ - ২৮তম বিসিএস পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ - ৫১০৫ জন উত্তীর্ণ, এর মধ্যে ২১৯০ জন ক্যাডার পদের জন্য সুপারিশকৃত;

১১/০৭/২০১০ - স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময়সূচী প্রকাশ;

০৮/০৮/২০১০ থেকে ২৬/০৮/২০১০ - স্বাস্থ্য পরীক্ষা অনুষ্ঠিত;

২৫/১০/২০১০ - সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নব-নিয়োগ শাখা কর্তৃক নিয়োগ প্রজ্ঞাপন প্রকাশ - ২০৮২ জনকে নিয়োগ প্রদান;

২৮/১০/২০১০ - নিয়োগ প্রজ্ঞাপনের গেজেট প্রকাশ;

০১/১২/২০১০ - ২৮তম বিসিএসে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পদায়িত কর্মস্থলে যোগদান।

অবশেষে দীর্ঘ ২ বছর ১০ মাস ৯ দিনের পথ পরিক্রমা শেষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন তারুণ্যে ঝলমল এক ঝাঁক গর্বিত উৎসাহী কর্মকর্তা। সে গর্ব সে উৎসাহ আজো সমান বেগে বহমান। আপামর জনসাধারণের উন্নয়ন ও সার্বিকভাবে প্রজাতন্ত্রের ক্রমোন্নতিতে আরো অনেক বছর এই কর্মকর্তাগণ মূল্যবান অবদান রাখবেন, এ প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা।

তথ্য সংকলনে:

ডা. মাসরুর-উর-রহমান আবীর, সহকারী রেজিস্ট্রার, প্লাস্টিক সার্জারি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা।

সূচিপত্র

বাংলা সাহিত্যে ভাষা আন্দোলন	মিনহাজুল ইসলাম জায়েদ	২২
প্রবন্ধ : 'ভাষা আন্দোলন ও এর বহুমাত্রিক তাৎপর্য'	রফিকুল ইসলাম	২৫
বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ : কেন এবং কিভাবে	মোঃ নাজমুল আহসান মুরাদ	২৭
যাপিত জীবন	রাজীব দাস	৩১
আয়কর : চলুন একটু হাসি	তাপস কুমার চন্দ	৩৫
উপবন এক্সপ্রেস	মোঃ গালিব হোসেন	৩৮
ফেসবুক প্রেগন্যান্সি	যাকিয়া সুলতানা নীলা	৪০
ভালবাসার বন্ধন	সাজেদুর রহমান	৪১
বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের দিনগুলি	রাজ কামাল আহমেদ	৪৪
বি.সি.এস.	সালমা মোস্তফা নুসরাত	৪৮
শুভ (!) নববর্ষ	জেবুন্নেছা জেরী	৪৯
স্বপ্ন যাত্রার শুরুটা	মাসরুর-উর-রহমান	৫২
অনুগল্প	মোঃ হেফজুর রহমান	৫৭
দারুচিনি দ্বীপ ভ্রমণ	মোঃ জাহিদুল ইসলাম	৫৯
ভ্রমণ কাহিনী শ্রীলঙ্কা : এশিয়ার বিস্ময়	ইনামুল হক সাগর	৬১
স্মৃতির পটে ভারত ভ্রমণ	মোঃ নজরুল ইসলাম	৬৫
ভারত যেমন দেখে এলাম	দীপংকর বর	৬৮
কার্বন নির্গমনের ভবিষ্যৎ	মোঃ শাহ আলম	৭০
আমার পৃথিবী	মোঃ কামরুল ইসলাম	৭২
আটাশের পরিচয়	আবু সালেহ্ মুহাম্মদ নোমান	৭৩
সভ্যতা	কুশল ভৌমিক	৭৪
অনিন্দ্য আটাশ	মোঃ মোকছেদ হোসেন	৭৫
আমি	জাহিদা বেগম	৭৬
ফল চুরি	এনামুল হক খান	৭৭
চাতক	গোপীনাথ ঘোষ	৭৮
ফিরে যাওয়ার গান	ডা. মধুসূদন মন্ডল	৭৯
Poems	Meherunnessa Shapla	৮০
I Am No Stranger	Noor-E-Alam	৮১
পরিশিষ্ট		
ফটোগ্যালারি		৮২

বাংলা সাহিত্যে ভাষা আন্দোলন

মিনহাজুল ইসলাম জায়েদ

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল অধিকারহারা বাঙালির গণসচেতনতার প্রথম বহিঃপ্রকাশ। ১৯৫২ এর ২১ ফেব্রুয়ারির রক্তস্নাত ঘটনাই প্রেরণা জুগিয়েছে ১৯৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬২ এর শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ এর ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জনে। একুশের চেতনা উদ্বুদ্ধ করেছে লাখো লাখো মুক্তি সেনানীকে ১৯৭১ এর মুক্তিসংগ্রামে অংশ নিতে। এভাবেই ১৯৫২ এর রক্তাক্ত চেতনার সিঁড়ি বেয়ে আমরা হয়েছি স্বাধীন, জন্ম হয়েছে লাল-সবুজ পতাকা সমেত নতুন দেশ, প্রাণের বাংলাদেশ।

একুশের চেতনা যে কেবল রাজনৈতিক সচেতনতাকে শাণিত করেছে তা নয়। সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউরদের আত্মত্যাগ ঋদ্ধ করেছে বাংলা শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিকেও। সমকালীন ঘটনাকে কল্পনার মিশেলে শব্দের গাঁথুনিতে লিপিবদ্ধ করে রাখেন লেখক, সাহিত্যিকরা। ভাষা আন্দোলন তেমনি আলোড়িত করে তোলে সমসাময়িক কবি-সাহিত্যিকদেরকে। এ ক্ষেত্রে কবিরাই ছিলেন অগ্রগণ্য। তবে এ কথা সত্য যে ভাষা আন্দোলনের বহু আগেই বাংলা কাব্য গেয়েছে তার নিজস্ব ভাষার জয়গান। মধ্যযুগের কবি আব্দুল হাকিমের 'বঙ্গবাণী' কবিতায় রয়েছে এর স্পষ্ট নিদর্শন:

'যে সব বঙ্গেতে জন্মে হিংসে বঙ্গবাণী

সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।'

অষ্টাদশ শতকের কবি রামনিধি গুপ্তের কবিতায়ও ফুঁটে উঠে মাতৃভাষার প্রতি অমোঘ দরদ–

'নানান দেশের নানান ভাষা
বিনে স্বদেশি ভাষা পুরে কি আশা?

কিংবা অতুলপ্রসাদ সেনের গর্বের উচ্চারণ–
'মোদের গরব মোদের আশা/আমরি বাংলা ভাষা যেন মাতৃভাষার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার অমলিন নিদর্শন।

ভাষা আন্দোলন পরবর্তী বাংলা সাহিত্য নিয়ে আলোচনায় প্রথমেই আসে কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরীর নাম। ১৯৫২ এর ২১ ফেব্রুয়ারির প্রাণহানির মর্মান্তিক অথচ গৌরবান্বিত এই ঘটনার সংবাদ চট্টগ্রামে বসে শোনার পরপরই তাৎক্ষণিক রচনা করেন দীর্ঘ কবিতা 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি। ৮২ লাইনের দীর্ঘ এই কবিতায় তিনি বর্বরোচিত এই ঘটনার হোতাদের ফাঁসির দাবি তুলেছেন–

'সেই চল্লিশটি রত্ন যেখানে প্রাণ দিয়েছে
আমরা সেখানে কাঁদতে আসিনি।
যারা গুলি ভরতি রাইফেল নিয়ে এসেছিল ওখানে
যারা এসেছিল নির্দয়ভাবে হত্যা করার আদেশ নিয়ে
আমরা তাদের কাছে
ভাষার জন্য আবেদন জানাতেও আসিনি আজ।
আমরা এসেছি খুনি জালিমের ফাঁসির আদেশ নিয়ে।'

কবিতার শেষাংশে তিনি দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন একদিন এই ত্যাগের বিজয় আসবে বলে।

২১ ফেব্রুয়ারির এই আত্মত্যাগের স্মৃতি রক্ষার্থে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা মিলে ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে শহীদের রক্তে রঞ্জিত হবার স্থানে নির্মাণ করেন সাড়ে ১০ ফুট উচ্চতা ও ৬ ফুট প্রস্থের বেদি যার নাম দেয়া হয় 'শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ'। নির্মাণের পরপরই এই স্মৃতিস্তম্ভটি হয়ে উঠে ঢাকাবাসীর আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। এটি যেন বিপ্লবী জনতার চেতনার মিনার। ২৬ ফেব্রুয়ারি স্তম্ভটি গুঁড়িয়ে দেয় পুলিশ। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ লেখেন তার অমর কবিতা 'স্মৃতিস্তম্ভ'। মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষার দাবিতে ভাষাশহীদদের আত্মদান যে বাঙালির হৃদয়ের মণিকোঠায় নতুন চেতনার দীপশিখা জ্বালিয়ে দিয়েছে তা ব্যক্ত হয়েছে এই কবিতায়–

ইটের মিনার ভেঙেছে, ভাঙুক, একটি মিনার গড়েছি আমরা
চার কোটি পরিবার
বেহুলার সুরে, রাঙা হৃদয়ের বর্ণ লেখায়।
পলাশ আর
রামধনুকের গভীর চোখের তারায় তারায়
দ্বীপ হয়ে ভাসে যাদের জীবন, যুগে যুগে সেই
শহীদের নাম
এঁকেছি প্রেমের ফেনিল শিলায়, তোমাদের নামে।
তাই আমাদের
হাজার মুঠির বজ্র শিখরে সূর্যের মত জ্বলে শুধু এক
শপথের ভাস্কর।

১৯৫৩ সালে প্রকশিত হয় হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রথম সাহিত্য সংকলন 'একুশে ফেব্রুয়ারি'। হাসান হাফিজুর রহমান, শামসুর রাহমান, আলাউদ্দিন আল অজাদ, সৈয়দ শামসুল হক, ফজলে লোহানী, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আনিস চৌধুরী, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, আব্দুল গণি হাজারি, জামাল উদ্দিন এবং আতাউর রহমান এই ১১ জনের কবিতা স্থান পায় সংকলনটিতে। 'একুশে ফেব্রুয়ারি' প্রকাশের আগে ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় একুশের প্রথম কবিতা সংকলন 'ওরা প্রাণ দিল'। সাতজন কবির কবিতা স্থান পায় সংকলনটিতে। বিমল চন্দ্র ঘোষের 'শহীদ বাংলা', সৈয়দ আবুল হুদার 'জন্মভূমি', হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'ঢাকার ডাক', মর্তুজা বশীরের 'পারবে না', নিত্য বসুর 'জননী গো', তানিয়া বেগমের 'বন্ধুর খোঁজে' এবং প্রমথ নন্দীর 'প্রিয় বন্ধু আমার' কবিতা নিয়ে প্রণীত হয় সংকলনটি।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর 'কোন এক মাকে' কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলো যেন নিছক পুত্র-জননীর পত্রালাপ নয়, সময়ের প্রতিচ্ছবি। মায়ের অতি আদুরে সন্তানটিও সময়মতো বাড়ি আসছে না মায়ের মতো মর্যাদাবান মায়ের ভাষা রক্ষার আন্দোলনে ব্যস্ত বলে–

'মাগো, ওরা বলে
সবার কথা কেড়ে নেবে।
তোমার কোলে শুয়ে
গল্প শুনতে দেবে না।
বলো মা তাই কি হয়?
তাই তো আমার দেরি হচ্ছে।
তোমার জন্যে
কথার ঝুরি নিয়ে
তবেই না বাড়ি ফিরবো।'

হাসান হাফিজুর রহমানের 'অমর একুশে' কবিতায় উঠে এসেছে ভাষাশহীদদের প্রাণের বিনিময়ে বাঙালির অন্তরে জাগিয়ে দেয়া চেতনার কথা। তাদের আত্মা যেন হৃদয়ে হৃদয়ে পোষণ করে সকল বাঙালি আজ অধিকার আদায়ের দাবীতে একত্র ও অটল হয়ে উঠেছে–

'তাঁদের একজন আজ নেই,
না, তারা পঞ্চাশ জন আজ নেই

আর আমরা সেই অমর শহীদদের জন্যে
তাদের প্রিয় মুখেরি ভাষা বাংলার জন্যে একচাপ পাথরের মতো
এক হয়ে গেছি,
হিমালয়ের মত অভেদ্য, বিশাল হয়ে গেছি।'

ভাষা আন্দোলন নিয়ে রচিত আরও কিছু আলোচিত কবিতা সমৃদ্ধ করেছে বাংলা সাহিত্যকে। এগুলোর মধ্যে জসীমউদ্‌দীনের 'যারা জান দিল, শামসুর রাহমানের 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা, আল মাহমুদের 'একুশের কবিতা, মহাদেব সাহার 'একুশের গান উল্লেখযোগ্য। ভাষা আন্দোলন নিয়ে রচিত গীতি কবিতাও ঋদ্ধ করেছে বাংলা সাহিত্যকে। আব্দুল গাফফার চৌধুরীর 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি একুশের প্রভাতফেরির গান হিসেবে স্বীকৃত। তাছাড়া, শামসুদ্দিন আহমদের 'ভুলবো না ভুলবো না, ভুলবো না আর একুশে ফেব্রুয়ারি গানটিও রচিত হয়েছে একুশের চেতনাকে ভিত্তি করে।

একুশ নিয়ে আরও অগণিত কবিতা রচিত হয়েছে এবং এ ধারা এখনো অব্যাহত আছে। বাংলা কবিতা যত দিন থাকবে একুশের অমর কীর্তি তথা ভাষা আন্দোলন তার অন্যতম অনুষঙ্গ হয়ে থাকবে।

ভাষা আন্দোলন নির্ভর সাহিত্যে কবিতা অগ্রগণ্য হলেও গল্প, উপন্যাস এবং নাটকেও উঠে এসেছে একুশের ঘনটাবলী। ১৯৫২ এর ২১ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত রূপ নিলেও বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি নিয়ে আলোচনা শুরু হয় মূলত দেশ বিভাগের পর থেকেই। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন নিয়ে প্রথম গল্প লিখিত হয় ১৯৫০ সালে। সাপ্তাহিক সৈনিক প্রত্রিকায় ঐ বছরের ঈদ সংখ্যায় গল্পকার ও ভাষা সৈনিক শাহেদ আলী রচিত 'মন ও ময়দান ভাষা আন্দোলনকেন্দ্রিক প্রথম গল্প। একুশের ঘটনাপুঞ্জি নিয়ে প্রথম বাংলা গল্প শওকত ওসমানের 'মৌন নয়। ১৯৫৩ সালে এটি প্রকাশিত হয়। এছাড়াও, সরদার জয়েন উদ্দীনের 'খরস্রোত, নূরউল আলমের 'এ কালের রূপকথা, জহির রায়হানের ' সূর্য গ্রহণ, 'একুশের গল্প, সেলিনা হোসেনের 'দ্বীপান্বিতা রাবেয়া খাতুনের 'প্রথম বধ্যভূমি, শহীদুল্লা কায়সারের 'এমনি করেই গড়ে উঠবে ভাষা আন্দোলন উপজীব্য উল্লেখযোগ্য গল্প। একুশের কাহিনী নির্ভর আরও বহু গল্প রচিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। ১৯৮৪ সালে রশীদ হায়দারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'একুশের গল্প নামক সংকলন। ১৯৯৯ সালে বাংলা একাডেমি হাসান আজিজুল হক, সেলিনা হোসেন, রশীদ হায়দার ও মোবারক হোসেনের সম্পাদনায় প্রকাশ করে 'একুশের গল্প নামক আরেকটি সংকলন গ্রন্থ। এ ছাড়া ২০০৯ সালে হায়াৎ মাসুদ, হোসনে আরা শাহেদ ও শাজ্জাদ আরেফিনের সম্পাদনায় গ্লোব লাইব্রেরি প্রকাশ করে 'ভাষা আন্দোলনের গল্প বইটি।

গল্প, কবিতার ন্যায় ব্যাপক না হলেও ৫২ পরবর্তী বাংলা উপন্যাসেও ভাষা আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটেছে। জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন একুশের প্রথম উপন্যাস। মাত্র তিন দিন দুই রাতের ব্যাপ্তি নিয়ে রচিত উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত উল্লেখযোগ্য অন্য উপন্যাসগুলো হলো সেলিনা হোসেনের 'যাপিত জীবন, 'নিরন্তন ঘণ্টাধ্বনি, শওকত ওসমানের 'আর্তনাদ, মোহাম্মদ আবদুল আওয়ালের 'আলো আমার আলো।

অল্প পরিসরে হলেও বাংলা নাটকেও ভাষা আন্দোলনের প্রভাব রয়েছে। একুশ নিয়ে প্রথম নাটক লেখেন অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী। তার রচিত 'কবর বাংলা নাট্য সাহিত্যে অনন্য স্থান দখল করে রেখেছে। নাট্যকার মমতাজ উদ্দীনের 'বিবাহ একুশ উপজীব্য আরেকটি উল্লেখযোগ্য নাটক। সাহিত্যের মানদণ্ডে কালোত্তীর্ণ না হলেও একুশকেন্দ্রিক অনেক নাটক রচিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে।

তথ্যসূত্র:

১. বাংলাপিডিয়া,
২. ভাষা আন্দোলন: সাহিত্য-সংস্কৃতি ও শিল্পকলায়: এম আর মাহবুব
৩. একুশের সংস্কৃতি, সমষ্টিচেতনা ও কবিতার ভবিষ্যৎ: রফিক উল্লাহ খান
৪. কবিতা ও গানে ভাষা আন্দোলন: আতাউল হক মাসুম

লেখক: সিনিয়র সহকারী প্রধান, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

প্রবন্ধ : 'ভাষা আন্দোলন ও এর বহুমাত্রিক তাৎপর্য'

রফিকুল ইসলাম

বাঙ্গালি জাতির সংগ্রামের ইতিহাসের ১৯৫২ সালের ২১ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক দিন। পৃথিবীর ইতিহাসে মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে এরূপ ঘটনার অন্যতম গৌরবগাথা একুশ। মূলত ভাষা আন্দোলন একটি বহুমাত্রিক আন্দোলন। একাধারে ভাষার অধিকারের আন্দোলন, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সাথে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠারও আন্দোলন।

১৯৪৭ এর পর পাকিস্থানপন্থী এবং উর্দু ভাবাপন্ন বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্থানি নেতাগণ বাঙালি জাতিকে তাদের জাতিসত্ত্বা থেকে বিচ্যুত করার জন্য উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্থানের রাষ্ট্র ভাষা কী হবে এ নিয়ে মত বিরোধের সূত্রপাত ঘটেছিল ১৯৪৭ সালের পূর্ব থেকেই। ১৯৪৭ সালের ১৮মে হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত উর্দু সম্মেলনের উপস্থিত নেতৃবৃন্দ এবং ১৯৪৭ সালে জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দীন আহমেদ উর্দুকে পাকিস্থানের রাষ্ট্র ভাষা করার প্রস্তাব করেন। এই অপতৎপরতার ধারাবাহিকতায় পাকিস্থানের গভর্ণর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালে ২১মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এবং ২৪মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তনে তিনি জোর দিয়ে উচ্চারণ করেন 'উর্দু এবং শুধু উর্দুই হবে পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা।

এর পেছনে যুক্তি ছিল বাংলা ভাষা হিন্দু ধর্মজাত বিজাতীয় সংস্কৃতির ধারক। তারা মনে করতেন, বাংলাভাষী মানুষের মধ্যে হিন্দু সংস্কৃতি যে ভাবে স্থান দখল করেছে তা থেকে ইসলামীকরণ বা প্রকৃত মুসলমানিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য উর্দু ভাষার মাধমে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা দরকার। আপাত দৃষ্টিতে বিষয়টি মুসলমানিত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে তা বাঙালিদের উপর নব্য ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার এক হীন চক্রান্ত। কিন্তু পাকিস্থানি শাসক গোষ্ঠি সফল হয়নি। একুশে ফেব্রুয়ারীর শহীদরা তাদের নিজেদের প্রাণোৎসর্গের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির জীবনকে জাগিয়ে দিয়ে গেছেন। আত্ন ত্যাগের মহত্তম উদাহরণ তারা। তিতুমীর,ক্ষুদিরাম, প্রীতিলতার আত্ন বলিদানের মিছিলের অবিচ্ছেদ্য অংশীদার বরকত,সালাম, রফিক,জব্বার। তাদের রক্তেই রোপিত হয়েছিল স্বাধীনতার বীজ। তাদেরই পথ ধরে আসাদ,মতিউরসহ, লাখো শহীদের রক্তে অর্জিত স্বদেশ। তাঁরা আমাদের ভাষা অধিকার রক্ষা করে গেছেন,দিয়ে গেছেন একটি সার্বভৌম ভূ-খন্ড।

১৯৪৭ সালে একটি আবেগময় রাজনৈতিক ভিত্তি দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর ভারত ও পাকিস্থান দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয় নতুন পাকিস্থান রাষ্ট্রটি ছিল কাঠামোগতভাবে একটি অদ্ভুত রাষ্ট্র। দুটি অংশের মধ্যে হাজার মাইলের ব্যবধান নিয়ে গড়ে উঠা রাষ্ট্রটির এক অংশে জন্ম থেকেই বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এই ষড়যন্ত্রের প্রথম আঘাত হলো ভাষাকে নিয়ে।

স্বাধীন পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে এ প্রশ্ন দেখা দিলে পূর্ব পাকিস্থানের সচেতন জনতা তাদের প্রাণপ্রিয় বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করার মানসে এক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সূচনা করে। অন্যদিকে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় তদানীন্তন পাকিস্থান সরকারের তল্পিবাহক নূরুল আমিন সরকার। এ ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদানের অভিপ্রায়ে এক দূর্বার আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে সংগ্রামী বাঙালি জনতা। এ দূর্বার আন্দোলনের ধারাবাহিকতার এক পর্যায়ে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী ঢাকার রাজপথ শহীদের রক্তে স্নাত হয়। ইতিহাসের পাতায় এই দূর্বার আন্দোলনেই ভাষা আন্দোলন।

১৯৫২সালে পল্টনের জনসভার খাজা নাজিমুদ্দিনের ' উর্দুই হবে পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা' এরূপ ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় ৩০ জানুয়ারি ঢাকায় প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। ৩১জানুয়ারি সর্বদলীয় কর্মী সমাবেশে সিদ্ধান্ত হয় যে,২১ফেব্রয়ারি প্রদেশ ব্যাপি 'রাষ্ট্র ভাষা দিবস' পালন করা হবে। ২১ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট থেকে ১০জন করে শান্তিপূর্ণ মিছিল বের করা হয়।

২১ফেব্রুয়ারি দুপুর ২.০০টার সময় ছাত্ররা সংসদ অধিবেশন অভিমূখে রওয়ানা হলে, উদ্দেশ্য ছিল সংসদে গিয়ে ভাষার দাবী জানাবে, পুলিশ গুলি ছোড়ে এবং সেখানেই নিহত হয় রফিক উদ্দীন ও আব্দুল জব্বার ,পরে হাসপাতালে মারা যায় আব্দুস সালাম এবং রাতে মারা যায় আবুল বরকত। ২ ফেব্রুয়ারি কার্জন হলে গায়েবানা জানাজা শেষে শান্তিপূর্ণ মিছিলে গুলি বর্ষণ করলে মারা যায় শফিউল্লাহ, ওহিউল্লাহ সহ ৪জন এবং পুলিশ জনতার উপর ট্রাক তুলে দিলে মারা যায় আব্দুল আওয়াল।

শহীদদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত প্রাণপ্রিয় বাংলাভাষা ঔপনিবেশিক ভাষার প্রাধান্যে বর্তমান কোনঠাসা। একুশ শতকে পৌছে তা ক্রমশ ব্যাপক হয়ে উঠেছে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় রাস্তায় সাইন বোর্ড কিংবা প্রতিষ্ঠানের নামের দিকে তাকালে। মূলত সমাজে প্রভুত্ব বিস্তারকারী গোষ্ঠি তাদের শ্রেণী স্বার্থ রক্ষা করার জন্যই বিশ্বায়ন ,আন্তর্জাতিকতা ইত্যাদির অজুহাত করে তারা সাবেক শোষকগোষ্ঠীর ভাষাকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মার্তৃভাষার আসনে বসিয়ে একুশের ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে।

পূর্বেই বলেছি ভাষা আন্দোলন একটি বহুমাত্রিক আন্দোলন এবং এর রয়েছে বহুমাত্রিক তাৎপর্য। একুশের স্বারণি বেয়ে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ নামক স্বতন্ত্র ভূখন্ডের গৌরবদীপ্ত পদচারণাকে উজ্জ্বল করে তুলেছিল। অর্থাৎ আজকের স্বাধীনতার বীজ রোপিত হয়েছিল বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে।

চেতনাগত দিক থেকে বায়ান্ন ও একাত্তর একই সূত্রে গাঁথা । সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের কারণে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তজার্তিক মাতৃভাষা দিবসের গুরুত্ব এখন বিশ্বব্যাপি স্বীকৃত। আজ পৃথিবীর দু'শয়ের অধিক দেশ বাংলাদেশের বায়ান্নর আন্দোলনকে স্মরণ করে আন্তর্জাতিক মার্তভাষা দিবস পালন করেছে।১৯৯৯সালে ইউনেস্কো কতৃক ঘোষিত সেই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের গৌরবকে বহুগুনে বাড়িয়ে দিয়েছে।

ভাষা আন্দোলনের সময় রাষ্ট্র ভাষা বাংলা দাবিটি ছিল নায্য ও গণতান্ত্রিক। কারণ, বাংলাই একমাত্র ভাষা নয় ; বরং বাংলা হবে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা। একুশ আমাদের শিখিয়েছে যে, সব ভাষার প্রতি সম্মান দেখানো উচিত। কারণ সব ভাষাই মূল্যবান।

ভাষিক এবং রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার কথা ভেবে আমরা যদি যুক্তিবাদী হই, তাহলে স্বীকার করতে হয় যে, মাতৃভাষার সর্বাঙ্গীন ব্যবহারের মাধ্যমেই একটি জাতি ও জাতি রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি সম্ভব। শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক রূপটা অবশ্যই হতে হবে মাতৃভাষায়-যে ভাষার ব্যবহারিক শেকড় তৃলমূল স্তর পর্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মে বিস্তৃত। আর সেজন্যই আন্তর্জাতিক প্রয়োজনে একজন বাংলা ভাষীকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজি বা তৃতীয় ভাষা হিসেবে অন্য কোন ভাষা শিখতে হবে। তেমনি জাতীয় প্রয়োজনে শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে এবং এর কোন বিকল্প নেই। তাতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা দুই-ই রক্ষা পাবে।

বস্তুত, ভাষা আন্দোলনের বহুমাত্রিক তাৎপর্য বাঙালির সামগ্রিক জীবনধারায় প্রতিফলিত করতে হলে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই

তাই এবার অমর একুশেতে আমাদের প্রার্থনা হোক, আমরা যেন একুশকে ইতিহাসের পাতায় গুঁজে না দিয়ে নতুন ইতিহাস রচনায় ধারন করেত পারি।

লেখক: সহকারি অধ্যাপক, বগুড়া আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া।

বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ : কেন এবং কীভাবে

মোঃ নাজমুল আহসান মুরাদ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণকে 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড'-এর স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেস্কো। 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড' তালিকার মাধ্যমে ইউনেস্কো বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে থাকে। ৪৬ বছর আগে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান) স্বাধীনতাকামী সাত কোটি মানুষকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতার সেই ঐতিহাসিক ভাষণ আজ বিশ্ব ঐতিহ্য প্রামাণ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃত। এর মাধ্যমে ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বিশ্বব্যাপী মানবজাতির মূল্যবান ও ঐতিহ্যপূর্ণ সম্পদ হিসেবে স্বীকৃত ও গৃহীত হলো।

৭ই মার্চের ভাষণবৃত্তান্ত

বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ছিল ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জনসমুদ্রের মঞ্চে দাঁড়িয়ে জাতির প্রতি এক উদাত্ত আহ্বান। ১৮ মিনিট স্থায়ী উক্ত ভাষণ বিকেল ২টা ৪৫ মিনিটে শুরু করে বিকেল ৩টা ৩ মিনিটে শেষ করেন। এই ভাষণে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) বাঙালিদেরকে স্বাধীনতাসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানান। এই ভাষণের একটি লিখিত ভাষ্য অচিরেই বিতরণ করা হয়েছিল। এটি তাজউদ্দীন আহমদ কর্তৃক কিছু পরিমার্জিত হয়েছিল। পরিমার্জনার মূল উদ্দেশ্য ছিল সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবিটির ওপর গুরুত্বারোপ করা। ১২টি ভাষায় ভাষণটি অনুবাদ করা হয়। নিউজউইক ম্যাগাজিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনীতির কবি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর ইউনেস্কো এই ভাষণকে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বিশেষজ্ঞগণের মতে ভাষণটির যে লিখিত রূপ ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি মন্ত্রমুগ্ধকর ছিল সরাসরি ভাষণ।

৭ই মার্চের ভাষণ কেন বিশ্ব ঐতিহ্য দলিল?

৭ই মার্চ নির্ধারিত সময়ে বঙ্গবন্ধু বিক্ষোভে উত্তাল রেসকোর্সের লাখো জনতার সভামঞ্চে এসে উপস্থিত হন। হৃদয়ে তার বাঙালির হাজার বছরের মুক্তির আন্দোলন, সংগ্রাম ও স্বপ্ন। মাথার ওপর আকাশে ঘুরছিল পাকিস্তানি যুদ্ধবিমান। এমনই এক সন্ধিক্ষণে তিনি তার ১৮ মিনিটের সংক্ষিপ্ত অথচ জগদ্বিখ্যাত ভাষণ রাখলেন। অসাধারণ এক বক্তব্য। যেমনি সারগর্ভ, ওজস্বী ও যুক্তিযুক্ত, তেমনি তির্যক, তিক্ষ্ণ ও দিকনির্দেশনাপূর্ণ। অপূর্ব শব্দশৈলী, বাক্যবিন্যাস ও বাচনভঙ্গি। একান্তই আপন, নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে গ্রিক নগররাষ্ট্র এথেন্সের রাষ্ট্রনায়ক পেরিক্লিসের অপর এক নগররাষ্ট্র স্পার্টার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত স্বদেশীয় সৈন্য ও সাধারণ মানুষের স্মরণে প্রদত্ত ভাষণ (৪৩১ খ্রিস্টপূর্ব) থেকে শুরু করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের ১৯৮৭ সালে বার্লিনে দুই জার্মানির মধ্যকার বিভক্তির দেয়াল (বার্লিন ওয়াল) ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার আহ্বানসংবলিত ভাষণ পর্যন্ত আড়াই হাজার বছরের বিশ্ব ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী ৪১ জন সামরিক-বেসামরিক জাতীয় বীরের বিখ্যাত ভাষণ নিয়ে ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ Jacob F Field, We Shall Fight on The Beaches : The Speeches That Inspired History শিরোনামে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন, যা ২০১৩ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে অন্যদের মধ্যে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট (মেসিডোনিয়া, প্রাচীন গ্রিস), জুলিয়াস সিজার (রোম), অলিভার ক্রমওয়েল (ইংল্যান্ড), জর্জ ওয়াশিংটন (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (ফ্রান্স), জোসেফ গ্যারিবোল্ডি (ইতালি), আব্রাহাম লিংকন (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), ভ্লাদিমির লেনিন (রাশিয়া), উইড্রো উইলসন (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), উইনস্টন চার্চিল (যুক্তরাজ্য), ফ্রাংকলিন রুজভেল্ট (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), চার্লস দ্য গল (ফ্রান্স), মাও সেতুং (গণচীন), হো চি মিন (ভিয়েতনাম) প্রমুখ নেতার বিখ্যাত ভাষণের পাশাপাশি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটি কেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ভাষণগুলোর অন্যতম হিসেবে অভিহিত? ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ সমগ্র বাঙালি জাতিকে নজিরবিহীনভাবে ঐক্যবদ্ধ এবং স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছিল। ভাষণে দৃপ্তকণ্ঠে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছিলেন, 'আমরা ভাতে মারবো। আমরা পানিতে মারবো...আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না।...রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাআল্লাহ।' যে কারণে বঙ্গবন্ধু আখ্যায়িত হন Poet of Politics। যেকোনো শ্রেষ্ঠ ভাষণই উত্থিত হয় বিদ্যমান পরিস্থিতি থেকে, ফলে তাকে তাৎক্ষণিক, স্বতঃস্ফূর্ত ও হৃদয় উৎসারিত বলা যায়। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণও ছিল তা-ই, যা লিখিত ছিল না। শ্রেষ্ঠ হিসেবে চিহ্নিত ইতিহাসখ্যাত ভাষণের অপর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আকারে নাতিদীর্ঘ। আব্রাহাম লিংকনের Gettysburg Address-এর শব্দ সংখ্যা ২৭২, সময় ৩ মিনিটের কম। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের সময় ১৮ মিনিট, শব্দ সংখ্যা ১১০৫; অপরদিকে মার্টিন লুথার কিংয়ের 'I have a dream' Address-এর সময় ছিল ১৭ মিনিট, শব্দ সংখ্যা ১৬৬৭।

ঢাকায় উপস্থিত বিদেশি সাংবাদিকসহ প্রায় সর্বমহলের ধারণা ছিল, বঙ্গবন্ধু তার ৭ মার্চের ভাষণে সরাসরি বাংলাদেশের স্বাধীনতা, যাকে বলা হয় UDI (Unilateral Declaration of Independence), ঘোষণা করবেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন প্রাজ্ঞ, অত্যন্ত বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিক। স্নায়ুযুদ্ধকালীন বিশ্বরাজনীতির গতিধারা বা মেরুকরণ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি যাতে দেশের অভ্যন্তরে কিংবা বহির্বিশ্বে একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হিসেবে কোনো অবস্থায় চিহ্নিত না হন, সে ব্যাপারে ছিলেন বিশেষভাবে সতর্ক। তেমনটি ঘটলে তৎকালীন বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন হয়তো অসম্ভব হয়ে পড়ত। তার সামনে দৃষ্টান্ত ছিল কীভাবে নাইজেরিয়ার বায়াফ্রা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন (১৯৬৭-১৯৭০) আদর্শিক বিভাজন নির্বিশেষে বৃহৎ শক্তির প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে কঠোরভাবে দমন করা হয়। তাই বঙ্গবন্ধুর অবস্থান ছিল : মেজরিটি (বাঙালি) মাইনরিটি (পশ্চিম পাকিস্তানি) থেকে বিচ্ছিন্ন হবে কেন? বরং মাইনরিটিই 'সিসিড' করছে বা আক্রমণকারী, এটাই বিশ্ববাসীর কাছে স্পষ্ট হোক। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল বস্তুত বাংলাদেশের স্বাধীনতারই ঘোষণা। তবে বিদ্যমান বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতির বাস্তবতায় তিনি কৌশলের আশ্রয় নেন। ভাষণের শেষভাগে তিনি এমনভাবে 'স্বাধীনতার' কথা উচ্চারণ করেন, যাতে ঘোষণার কিছু বাকিও থাকে না, অপরদিকে তার বিরুদ্ধে একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার (UDI) অভিযোগ উত্থাপন করাও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে আদৌ সহজ ছিল না। বঙ্গবন্ধুর এ কৌশলী অবস্থান সুদক্ষ সমরকুশলীদের জন্যও বিস্ময়কর। বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণ কোনোক্রমে (UDI) হিসেবে চিহ্নিত হলে সে অবস্থায় এটি বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে বিবেচিত হতো না। বাঙালির জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে দীর্ঘ গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় চূড়ান্ত পর্বে এসে একটি ভাষণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু যেভাবে দ্রুত তার নিরস্ত্র জাতি-জনগোষ্ঠীকে তাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার স্বপ্ন অর্জনে সশস্ত্ররূপে আবির্ভূত হতে উদ্বুদ্ধ করেন, সেটিও এক বিরল ঘটনা। ৭ মার্চ এক বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সর্বদিক বিবেচনায় রেখে ধীরস্থির অথচ তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু এমনই এক ভাষণ রাখলেন, যার নজির ইতিহাসে বিরল। ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে পরিগণিত অধিকাংশ নেতার বক্তব্য যেখানে লিখিত (আব্রাহাম লিংকনের 'Gettysburg Address সম্পূর্ণ এবং মার্টিন লুথার কিংয়ের I have a dream' Address-এর প্রথম দিকের বক্তব্য ছিল লিখিত) সেখানে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটি ছিল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অলিখিত, স্বতঃস্ফূর্ত, যা এ ভাষণকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ পৃথিবীর একাধিক ভাষায় ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এত দীর্ঘ সময় ধরে (৪৬ বছর) পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো নেতার ভাষণ সেদেশের মানুষ শ্রবণ করে আসছে কিনা সন্দেহ। এটি এমনই ব্যঞ্জনাপূর্ণ ও গীতিময় যে, যতবার শ্রবণ করা হয়, ততবারই মনে হবে এই প্রথমবার শোনা হল, কখনো পুরনো মনে হয় না।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ একটি জাতি-জনগোষ্ঠীর মুক্তির কালজয়ী সৃষ্টি, এক মহাকাব্য। বহুমাত্রিকতায় তা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। শুধু বাঙালির জন্যই নয়, বিশ্বমানবতার জন্যও অবিস্মরণীয়, অনুকরণীয় এক মহামূল্যবান দলিল বা সম্পদ। ইউনেস্কোর সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে এটিই স্বীকৃত হয়েছে। গণতন্ত্র, উচ্চ মানবিকতা, ত্যাগ ও দেশপ্রেমের উজ্জ্বল আদর্শ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রাম, জাতিভেদ-বৈষম্য ও জাতি-নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিশ্বমানবতার মুক্তির সংগ্রামে যুগে যুগে এ ভাষণ অনুপ্রেরণা জোগাবে। সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতা, রাষ্ট্রনায়ক, সমরকুশলী–সবার জন্যই এ ভাষণে অন্যতম অনুপ্রেরণা।

তোফায়েল আহমেদ বলেন, '৭ই মার্চের ভাষণ একটি অলিখিত ও অতুলনীয় ভাষণ'। তিনি আরও বলেন, 'সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপ করা সম্ভব কিন্তু বাঙালি জাতির প্রতি জাতির জনকের যে ভালোবাসা ছিল তা পরিমাপ করা অসম্ভব।'
ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান বলেন, '৭ই মার্চের ভাষণ এখনো আমাদের স্পর্শ করে আমাদের শিহরিত করে।'
প্রফেসর আব্দুল মান্নান বলেন, 'বঙ্গবন্ধু ২৩ বছরের ইতিহাস ১৮ মিনিটে বর্ণনা করেছেন। এই ভাষণের মধ্য দিয়ে তিনি সমগ্র বাংলাদেশকে একত্র করেছেন।'

অধ্যাপক আখতারুজ্জামান বলেন, 'বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ একই কথা। আর এই বই ভবিষ্যতে জাতিকে অনুপ্রেরণা দিয়ে যাবে এবং নতুন চিন্তার দ্বার উন্মোচিত হবে।'

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, বিশ্ব ঐতিহ্যের দলিল হিসেবে কেন বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

৭ই মার্চের ভাষণের পটভূমি

৭ই মার্চ ১৯৭১ বাঙালির জাতীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় দিন। এ দিন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালির ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যান) লাখো জনতার সমাবেশে তার জাতির উদ্দেশে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ রাখেন- ইতিহাসখ্যাত ৭ই মার্চের ভাষণ। তৎকালীন পাকিস্তানের জনগণই শুধু নয়, সারা বিশ্বের মানুষ ঔৎসুক্য নিয়ে তাকিয়ে ছিল- বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে কী বলেন। ঢাকায় তখন বিদেশি সব গুরুত্বপূর্ণ পত্রপত্রিকা ও সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য সেটি ছিল এক অন্তিম মুহূর্ত। অপরদিকে, স্বাধীনতার চেতনায় উদ্দীপ্ত বাঙালি জাতির জন্য ছিল পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের শৃঙ্খল ছিন্ন করে জাতীয় মুক্তি বা স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর চূড়ান্ত সংগ্রামের আহ্বান। এর পটভূমিতে ছিল ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালিদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী দল আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সত্ত্বেও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হরের পরিবর্তে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানি সামরিক জান্তার বাঙালি জাতিকে সমূলে নির্মূল করার ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ। এর প্রতিবাদে একদিকে চলছিল বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সারা বাংলায় সর্বাত্মক শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন, অপরদিকে দেশের বিভিন্ন স্থানে নিরস্ত্র জনগণের ওপর পাকিনি সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণ ও হতাহতের ঘটনা।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক শাসকগোষ্ঠী এই দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে বিলম্ব করতে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে তাদের উদ্দেশ্য ছিল, যে-কোনভাবে ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের হাতে কুক্ষিগত করে রাখা। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশন আহ্বান করেন। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে ১ মার্চ এই অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি ঘোষণা করেন। এই সংবাদে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সারাদেশে একযোগে হরতাল পালিত হয়। তিনি ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় সমগ্র পূর্ব বাংলায় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এই পটভূমিতেই ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় লক্ষ লক্ষ সংখ্যক মানুষ একত্র হয়; পুরো ময়দান পরিণত হয় এক জনসমুদ্রে। এই জনতা এবং সার্বিকভাবে সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবুর রহমান তার ঐতিহাসিক ভাষণটি প্রদান করেন।

৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্বস্বীকৃতির নেপথ্য

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো প্যারিসে অনুষ্ঠিত এর দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে ৩০ অক্টোবর ২০১৭ তারিখ বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণকে 'বিশ্ব ঐতিহ্য দলিল' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তা সংস্থাটির 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার'-এ অন্তর্ভুক্ত করেছে। ১৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা/বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক দুবছর ধরে প্রামাণ্য দালিলিক যাচাই-বাছাই শেষে ইউনেস্কোর সেক্রেটারি জেনারেলের সম্মতিক্রমে এটি সংস্থার নির্বাহী কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। দীর্ঘ ৪৬ বছর পরে হলেও জাতিসংঘের মতো বিশ্বসংস্থার এ সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

৭ই মার্চের ভাষণের বিশ্ব স্বীকৃতির নেপথ্যে ছিলেন শহীদুল ইসলাম যিনি ২০১২ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তিনিই প্রথম এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি জানান যে, '৭ই মার্চের ভাষণটি ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পাওয়ার আবেদন করতে একই নমিনেশন ফাইল তৈরি করতে হয়। তাতে এটি লিখিতভাবে আছে, না অলিখিতভাবে আছে এবং তাতে যে কন্টেন্ট আছে, সেটা বিশ্বের মানব সম্প্রদায়ের জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কিনা- সেটার বিবেচনারও একটি বিষয় ছিল।' এই নমিনেশন ফাইল তৈরিতে শহীদুল ইসলামকে সাহায্য করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক, তৎকালীন ডিএফপির ডিজি লিয়াকত আলি খানসহ অনেকে। পরবর্তীতে ৮ মার্চ রেডিও বাংলাদেশ ঢাকা কেন্দ্র থেকে সম্প্রচার করা হয়েছিল। এছাড়াও ৭ মার্চ ভাষণের অরিজিনাল ৩৫ মিলিমিটার ভিডিও ফুটেজ- ধারণ করেছিলেন পাকিস্তান ফিল্ম ডিভিশনের চিফ মহিবুর রহমান খান।' বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ২০১৩ সালে এটির একটি ডিজিটাল অডিও ভিশন সংস্করণ তৈরি করে। আরও পরে ২০১৪ সালে ২০১৪ সালে তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয় তৈরি করে একটি সংস্করণ। এর ২৩ মে ২০১৬ সবগুলোই প্যারিস মিশন জমা দেয় ইউনেস্কোর কাছে। এরপর যাচাই বাছাই প্রক্রিয়া শুর হয়। প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ের পর ২০১৭'র ফেব্রুয়ারিতে তারা এটি ফেরত দিলো কিছু সংশোধনের জন্য। ১৭ এপ্রিল ২০১৭ তে সংশোধনের পর আবার জমা দেয়া হয়। এরপর এদের চূড়ান্ত অথোরিটি ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার অ্যাডভাইজারি কমিটি এটা ৩০ অক্টোবর এই ভাষণটিকে স্বীকৃতি দেয়। ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডভাইজরি কমিটি ইউনেস্কোর মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড (এমওডবিউ) কর্মসূচির অধীনে আন্তর্জাতিক তালিকায় (ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার) মোট ৭৮টি দলিলকে মনোনয়ন দিয়েছে। এ তালিকায় ৪৮ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর সাতই মাভোষণটিকে স্থান দেওয়া হয়েছে। প্যারিসে ইউনেস্কোর প্রধান

কার্যালয়ে ২৪ থেকে ২৭ অক্টোবর চার দিনের এক সভায় বসেছিল ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডভাইজরি কমিটি (আইএসি)। সেখানে ইউনেস্কোর মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল নিবন্ধনের জন্য ৭৮টি দলিলকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। আইএসির এই কমিটিতে ছিলেন ১৫ জন বিশেষজ্ঞ। এর চেয়ারম্যান ছিলেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের ন্যাশনাল আর্কাইভের মহাপরিচালক আবদুল্লাহ আলরাইজি। তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পক্ষ থেকে নতুন করে প্রস্তাব করা ঐতিহাসিক দলিল পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করেন। দুই বছরের প্রক্রিয়া শেষে ২০১৬-১৭ সালের জন্য দলিলগুলোকে মনোনয়ন দেওয়া হয়।
মনোনয়নগুলো সম্পর্কে সুপারিশ করে ইউনেস্কোর মহাপরিচালক ইরিনা বকোভা বলেন, 'আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি, এ কর্মসূচি পরিচালিত হওয়া উচিত দালিলিক ঐতিহ্য ও স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য।'

এভাবেই বিশ্ববাসীর কাছে স্বীকৃতি পায় বাঙালির ইতিহাসের অন্যতম এই দলিল। নানা বন্ধুর পথ পেরিয়ে ৭ মার্চের এই ভাষণ তাই এখন কেবল বাংলাদেশের নয়, বিশ্ব ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ। এ সম্পদকে যথাযথভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে তরুণপ্রজন্মের মধ্যে। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ৭ই মার্চের ভাষণের আদর্শে গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই স্বাধীনতার চেতনায় সমৃদ্ধ অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে উঠবে।

তথ্যনির্দেশ

১. শেখ মুজিবুর রহমান, 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০১৪

২. মোঃ শাহ আলমগীর, বঙ্গবন্ধু ও গণমাধ্যম, জুন ২০১৫, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ঢাকা

৩. https://www.lexilogos.com/declaration/bengali.htm [accessed on March 12, 2019]

৪. মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা পত্র, https://www.lexilogos.com/declaration/bengali.htm [accessed on March 13, 2019]

৫. https://www.bhorerkagoj.com/2017/11/17/. [accessed on March 12, 2019]

৬. https://www.dw.com/bn/ /. [accessed on March 12, 2019]।

৭. https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%87_%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%A3. [accessed on March 11, 2019]

৮. https://www.dw.com/bn/ বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ/ [accessed on March 12, 2019]

৯. প্রাগুক্ত

লেখক: মোঃ নাজমুল আহসান মুরাদ, বিসিএস সাধারণ শিক্ষা
সহকারী অধ্যাপক (দর্শন) ও গবেষণা কর্মকর্তা, মাউশি অধিদপ্তর

যাপিত জীবন

রাজীব দাস

আমি পেশায় মানুষের ডাক্তার নই বা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তবে সমাজের ডাক্তার ভাবতে পারেন, নিজের পেশায় কাজ করার অভিজ্ঞতা নিজেকে সব সময় প্রস্তুত রাখতে হয়। অসংখ্য মানুষের সমস্যা সমাধান খুঁজতে গিয়ে নিজের মনের অজান্তেই কিছু কিছু বিষয়কে জীবন চর্চায় খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। কিছু সাধারণ মানের তথ্যের ও কাজের সমন্বয় আমাদের ব্যক্তিগত তথা জীবনকে সুখময় করে তুলতে পারে। যা মানুষের সার্বিক সফলতা বা চূড়ান্ত লক্ষ্যের সিঁড়ি হতে পারে। এই ক্ষুদ্র টুকরো টুকরো বিষয়গুলোকে জীবন থেকে হটাতে আমার এ প্রয়াস।

ক্ষুদ্র বিষয়গুলো:

- টেনশন
- ডিপ্রেশন
- হতাশ
- আত্ম বিনির্মাণ

❖ টেনশন

টেনশন বা উৎকণ্ঠা আমাদের জীবনে লেগেই আছে। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে টেনশন বাড়ছে। সব সময় উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকলে নানারকম অসুখ-বিসুখ হতে পারে। সকলেই এ টেনশন থেকে মুক্তি চায়। তবে কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করলে অনেকটাই টেনশনমুক্ত থাকা যায়। দীর্ঘদিন টেনশন থেকে যেসব অসুখ হতে পারে তার মধ্যে রয়েছে:

১. উচ্চ রক্তচাপ
২. ডায়াবেটিস
৩. হার্টের বিভিন্ন সমস্যা
৪. পেপটিক আলসার
৫. হজমে সমস্যা
৬. স্ট্রোক
৭. হতাশা
৮. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া

সুতরাং টেনশন থেকে মুক্তির কিছু উপায় অবশ্যই বের করতে হবে। এখানে সহজ কয়েকটি পদ্ধতি আলোচনা করা হলো:

১. টেনশনের সময় ফাঁকা জায়গায় কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলে টেনশন অনেকটা কমে যায়।
২. চেয়ারে বসে কাজ করতে হলে মাঝে মাঝে চেয়ারে সারা শরীর ছড়িয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকলে উপকার হবে। সম্ভব হলে মৃদু আওয়াজে পছন্দের গান শুনব।
৩. টেনশন থেকে মুক্তির সবচেয়ে ভালো উপায় হলো মেডিটেশন। ঘুম থেকে উঠে বা ঘুমাতে যাওয়ার সময় কিছুক্ষণ মেডিটেশন করলে টেনশনমুক্ত থাকা যায়।
৪. নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে। ব্যায়াম করলে টেনশন অনেক কমে যায়। ব্যায়াম করলে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায়। পেশির গঠন সুন্দর হয়, ত্বক উজ্জ্বল হয় এবং বয়সের ছাপ ঠেকিয়ে রেখা যায়।
৫. কোনো কারণে মনের মধ্যে টেনশন তৈরি হলে সাথে সাথে জোর করে মন অন্যদিকে নিয়ে যেতে হবে। কোনো ফাঁকা জায়গায় বা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে কয়েকবার শ্বাস নিতে হবে এবং ছাড়তে হবে।
৬. ভালো বন্ধুদের সাথে মিশতে হবে। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বন্ধু অনেক মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে।
৭. প্রার্থনা করলে টেনশন কমে। নিয়মিত প্রার্থনা করতে হবে এবং স্রষ্টার কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

৮. সারাদিন কাজ শেষে বাড়িতে ফিরে, হাতমুখ ধুয়ে, বিছানায় শুয়ে, সারা শরীর ছড়িয়ে দিতে হবে। মনে কোনো চিন্তা আনা যাবে না এই সময়।

৯. বিছানায় শুয়ে জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিলে অনেক উপকার হয়।

১০. সবকিছু হালকাভাবে নিতে হবে। কোনো কিছু নিয়ে পড়ে থাকা ঠিক নয়।

টেনশন থেকে অবশ্যই মুক্ত থাকতে হবে। তা না হলে নানারকম অসুখ-বিসুখে ভুগতে হবে। উপরোক্ত পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করলে টেনশনমুক্ত থাকা সম্ভব।

❖ হতাশা

হতাশা একটি মানসিক রোগ। মানুষ কাজে ব্যর্থ হয়ে হতাশ হয়ে পড়ে আর এর ফলেই আস্তে আস্তে সে নিজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে।

হতাশা দুর্ঘটনার চেয়েও বেশি ক্ষতিকর। পঙ্গু মানুষকে কর্মক্ষম হয়ে জীবন সংগ্রামে দেখা যায় অথচ হতাশা গ্রস্তরা একেবারে ভেঙ্গে পড়ে এবং সে ক্ষেত্রে তাদের সব অঙ্গই স্থবির হয়ে যায়।

হতাশা যেসব ক্ষতি করতে পারে

- আপনাকে উদ্যমহীন করে ফেলে।
- হতাশ মানুষ পৃথিবীর ভালো কিছু সহ্যই করতে পার না।
- দৃষ্টিকে নিচের দিকে নামিয়ে আনে।
- ধার্মিক লোকও অধার্মিক নাস্তিক হয়ে পড়ে।
- আত্মভিমানী হয়, আত্মহত্যা এদের জন্য বিচিত্র নয়।
- সংসার ও কর্মজীবনে অশান্তিতে থাকে ও অশান্তি সৃষ্টি করে।
- সুবিচার কমে যায়। অন্যের সামান্য অপরাধের জন্য গুরুদণ্ড দিতে পারে।

এসব ছাড়াও আরো অনেক ক্ষতি হতে পারে। হতাশাগ্রস্ত লোক নিজের ক্ষতির পাশাপাশি সমাজেরও ক্ষতি করতে পারে।

আমাদের সাধারণ ধারণাটা হচ্ছে, মানুষ যখন বিশেষ একটা আশা নিয়ে কাজ করে এবং বিফলতার মধ্য দিয়ে তার সেই আশা ভঙ্গ হয় তখন সে হতাশ হয়ে পড়ে।

আসলে কি কথাটা ঠিক? বিফলতা মানুষকে অকেজো করে ঠিকই, কিন্তু যারা জীবনে জয়ী হয়েছেন, তারাও তো কমবেশি এই বিফলতার উপর পা রেখেই সাফল্য অর্জন করেছেন।

হতাশার সৃষ্টি তিন কারণে

১. নিজের কর্মক্ষমতা সম্পর্কে অগাধ বিশ্বাসের অভাব।

২. পর্যাপ্ত ধৈর্যের অভাব

৩. কর্ম সম্পাদনে কৌশলকে আবিষ্কার করতে না পারলে অথবা অন্যের আবিষ্কৃত কৌশলে চলতে গিয়ে সেটা আয়ত্তে না আনতে পারলে।

হতাশা মানসিক রোগ হলেও এর থেকে মুক্তির জন্য সাইকিয়াট্রিস্টের প্রয়োজন নেই। আপনি নিজেই এর থেকে নিস্তার পেতে পারেন।

প্রথমত, নিজের উপর বিশ্বাস আনতে হবে। যাকে বলে আত্মবিশ্বাস। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান কোনো ব্যক্তি কখনো হতাশায় মুষড়ে পড়ে না। প্রচণ্ড আত্মবিশাসী ব্যক্তি সমস্ত পরাজয়, বাধা-বিপত্তি ও বিফলতার মধ্য দিয়েই সফলতা নিয়ে আসে। তারা এগুলোকে শিক্ষাদাতা হিসেবে গ্রহণ করে।

দ্বিতীয়ত, পর্যাপ্ত ধৈর্যের অধিকারী হবার চেষ্টা করুন। ধৈর্য ধরলে এর সুফল পাবেন।

রাজা রবার্ট ব্রুস এর কথা সবারই জানা। সামন্য মাকড়সার ধৈর্য ও অধ্যবসায় দেখে তিনি তার দেশকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন।

তাহলে আপনি কেন অল্পতেই হতাশ হবেন? বিজ্ঞানী টমাস আলফা এডিসনের জীবনে বহুবার ব্যর্থতার শিকার হয়েছেন। এমন ভাবে ব্যর্থ খুব মানুষ লোককেই দেখা যায়। অথচ তিনি থেমে যাননি বা হতাশার শিকার হননি। তিনি বলেছেন কোনো মানুষেরই হতাশ হবার কারণ নেই, যদি সে জীবনের ক্ষেত্রে চারটি বিষয়ে মনোযোগী হয়।

নিচের চারটি বিষয় তিনি গ্রহণ করেছেন এবং এগুলোকে হতাশাগ্রস্তদের জন্য উপদেশ হিসেবে রেখে গেছেন সেই চারটি বিষয় হচ্ছে:

১. অধ্যবসায়কে করো তোমার অন্তরঙ্গ সুহৃদ।

২. অভিজ্ঞতাকে করো তোমার বিজ্ঞ মন্ত্রণাদাতা।

৩. সতর্কতাকে করো তোমার অগ্রজ।
৪. আশাকে করো তোমার তত্ত্বাধায়ক প্রতিভা।
৫. এই চারটি বিষয়কে যিনি নিজের জীবনে আঁকড়ে ধরতে পারবেন, ব্যর্থতা এবং হতাশা তার ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারবে না।

তাই আসুন, ব্যর্থ হয়ে হতাশাগ্রস্ত না হয়ে নব-উদ্যমে কাজ আরম্ভ করি।

❖ ডিপ্রেশন

এ রোগের প্রধান লক্ষণ হলো কিছু করতে ইচ্ছে না করা, জীবন একঘেয়ে মনে হওয়া, জীবনের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলা এবং সর্বশেষে আত্মহত্যার প্রবণতা। যেকোনো কারণেই হোক এর প্রকোপ দিন দিন বাড়ছে। এ থেকে মুক্তি পাওয়ার অনেক পথ আছে। কিন্তু নিরসনের পথ থাকলেই তো হবে না, রোগীর নিজের রোগ নিরাময়ের আন্তরিক ইচ্ছা থাকতে হবে। যে সব উপায়ে বিষণ্নতা কাটিয়ে ওঠা যায়:

১. নিজেকে বিশ্লেষণ করতে শিখুন, কোথায় থেকে এর উৎপত্তি তা খুঁজে বের করার চেষ্ট করুন এবং তা নির্মূলের উপায় খুঁজুন। কারণ সবার ক্ষেত্রে এক নিয়ম খাটে না। আর আপনি যতটা নিজের সমস্যা সম্পর্কে বুঝবেন অন্য কেউ তা বুঝবে না। তাই নিরসনের পদ্ধতি নিজেই বের করুন।
২. হাসিখুশি থাকার চেষ্ট করুন। খুব সহজে হাসতে শিখুন। হাসি মানুষের দুঃখ অনেক কমে দেয়। হাসিতে আপনার দুঃখ যত সহজে লাঘব হবে তা অন্য কিছু দিয়ে হবে না।
৩. দুঃখ কে প্রশ্রয় দেবেন না। দিলেই দুঃখ মনে চেপে বসবে। সেজন্য যত দুঃখই আসুখ তা স্বাভাবিকভাবে নেয়ার চেষ্টা করুন। জীবনে দুঃখ আসবেই কিন্তু তাই বলে দুঃখ ভারাক্রান্ত হলে জীবনটাও দুর্বিষহ হয়ে উঠবে।
৪. কথা বলুন যখন মন খারাপ হবে তখন অনবরত কারো সাথে কথা বলে মনকে হালকা করার চেষ্টা করুন। অথবা কোনো মজার বই পড়ুন।
৫. অযথা বসে থাকবেন না। কাজ করুন। কাজে ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করুন। কারণ অবসর ও বিষণ্নতা একে অন্যের পরিপূরক।
৬. ব্যায়াম করুন। প্রতিদিন সকালে উঠে খোলা জায়গায় ব্যায়াম কিংবা হাঁটাহাঁটি করুন। দেখবেন মন কেমন চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।
৭. মনকে বশ মানাতে শিখুন। মন যা চাইবে তা সব সময় করবেন না। আত্মহত্যার কথা এসময় মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু নিজেকে বোঝান আত্মহত্যা করলে কেউ আপনাকে বাহবা দেবে না। মর্যাদা নিয়ে মরতে চাইলে আত্মহত্যার কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলুন।
৮. অন্যদের সাথে তুলনা করতে শিখুন, তবে তা কেবল আপনার চেয়ে খারাপভাবে যারা বেঁচে আছে তাদের সাথে। মনকে প্রবোধ দিন অন্যের সাথে তুলনা করে।
৯. আশাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করুন। কারণ আশাহীন মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না।

যেসব উপায় বলা হলো সবার ক্ষেত্রে সবগুলোই প্রযোজ্য নাও হতে পারে। সুতরাং আপনাকে বেছে নিতে হবে কোনটি আপনার জন্য প্রযোজ্য। সেভাবে চেষ্টা করতে হবে, আর সেই সাথে থাকতে হবে মনোবল, তবে বিষণ্নতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারবেন।

❖ আত্মবিনির্মাণ

নিচের কথাগুলো যতবার সুযোগ পাবেন মনে মনে বলবেন। এটি একধরনের অটোসাজেশন। কথাগুলো প্রতিদিন মনে মনে শতাধিকবার বললে তা অবচেতন মনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে, আত্মনির্মাণের পথে আপনি এগিয়ে যাবেন কয়েক ধাপ।

- আমি শান্তি সঠিক পথের অনুসারী। প্রতিদিন আমার অন্তরের আলো ও প্রশান্তি বাড়ছে।
- সবাই ভালোবাসা পেতে চায়, ব্যতিক্রম কয়েকজন ভালোবাসা দিতে চায়। আমি ব্যতিক্রমদের একজন হতে চাই।
- আমি প্রকৃতির সাথে একাত্ম। প্রকৃতির নেপথ্য স্রোতে মিশে আমি আমার গন্তব্যে পৌঁছব।
- শেষ পর্যন্ত সবকিছুই আমার প্রত্যাশা পূরণের পথকে সুগম করে দেবে। আমি প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য সবরের সাথে অপেক্ষা করব।
- আমি আমার আচরণ ভুলগুলোকে প্রতিদিন চিহ্নিত করব। ফলে সবার সাথে সুন্দর আচরণ আমার অভ্যাসের অংশে পরিণত হবে।

- দুঃখ ও আনন্দকে আমি সহজভাবে গ্রহণ করব। ফলে আমার জীবন হয়ে উঠবে আরো আনন্দময় ও বর্ণাঢ্য।
- দিন দিন আমি আরো স্পষ্টভাবে প্রতিটি অভিজ্ঞতার মূল্য বুঝতে পারছি। প্রতিটি নতুন অভিজ্ঞতা আমাকে আরো দক্ষ করে তুলছে।
- মমতা সকল দুঃখের উপশম করে। আন্তরিক হাসি দিয়ে মানুষকে সম্ভাষণ জানিয়ে আমি এই বিশ্বজনীন মমতাকেই প্রকাশ করব।
- দৃষ্টিভঙ্গির সামান্য পরিবর্তন জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। আমি পবির্তনের জন্য প্রস্তুত।
- সৎসঙ্গ, মেডিটেশন এবং নিঃস্বার্থ কাজ হলো অন্য মানুষে উত্তরণের সিঁড়ি। আমি এই সিঁড়ি বেয়ে ধাপে ধাপে উঠব।
- আমি প্রো-অ্যাকটিভ। ভুল করার সাথে সাথেই আমি তা স্বীকার করি। আমি ভুল শুধরে নিই এবং ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি। এটিই অনন্য মানুষের পথ।
- সকালে আধাঘণ্টা মেডিটেশন আমার চিন্তা, সিদ্ধান্ত ও নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেবে। তাই আমি নিয়মিত সকালে মেডিটেশন করব।
- আমি আগে অন্যদের বুঝতে চেষ্টা করি, তাহলেই আমাকে বোঝা তাদের জন্য সহজ।
- সততা ও গুণের কদর সর্বকালে সর্বদেশে। আমি আমার সকল সুপ্ত গুণের বিকাশ ঘটাব।
- আমি সবসময় সঠিক সময়ে সঠিক স্থানে সঠিক শব্দ প্রয়োগ করব।
- আমার হৃদয় গভীরভাবে অনুভব করতে পারে। আমার মস্তিষ্ক যেকোনো জঠিল বিষয় অনুধাবন করতে পারে। অজেয় ইচ্ছা শক্তি রয়েছে আমার। আমি বিজয়ী হব।
- সত্যিকারের সাহয্য আসে নিজের অন্তর থেকে। আমার অন্তরই আমাকে সবসময় সাহায্য করবে।
- আমি একজন রোগীকে সবসময় বলব, আপনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন। এ ধরনের রোগ থেকে দ্রুত সুস্থ হয়েছেন এমন ব্যক্তির কথাও তাকে জানাব।
- আমার অন্তর পরিষ্কার। তাই কৃৎসা আমাকে কালিমালিপ্ত করতে পারবে না।
- আমি চিন্তা করে কথা বলি। কিন্তু করে কথা বললে আমি অন্যদের মনেও সাফল্যে বীজ বপন করতে পারব।
- আমার মনকে সবসময় আমার নিয়ন্ত্রণে রাখব। যাতে করে আমি বলতে পারি হ্যাঁ এটা আমার মন।
- শৃঙ্খলা, মনোয়োগ এবং প্রজ্ঞা মানুষকে পৌঁছায় আশীর্বাদপূর্ণ প্রশান্ত জীবনে। আমি অনন্য মানুষের এই সুন্দর পথ অনুসরণ করব।
- কোমল পানীয় স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। আমি নিজে কোমল পানীয় পান করব না এবং কাউকে কখনো কোমল পানীয় পরিবেশন করব না।
- ধূমপান থেকে ক্যান্সার হয়। আমি নিজে ধূমপান করব না এবং ধূমপায়ীদের সাথে বন্ধুত্ব করা থেকে বিরত থাকব।
- সকালে পূর্ণ আহার, দুপুরে তার চেয়ে কম, রাত্রে একেবারেই হালকা খাবার এটাই খাবার গ্রহণের বৈজ্ঞানিক পন্থা। আমি এই নিয়ম অনুসারে সব সময় সচেষ্ট থাকব।
- যেকোনো আলোচনায় কার নিন্দা করা থেকে সচেতনভাবে বিরত থাকব। আমি কখনো পরচর্চা করব না।
- আমি কখনো ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করি না, নিজের ধর্ম আন্তরিকভাবে পালন করি, অন্যকে তার ধর্ম পালনের সুযোগ দিই।
- ছেলেমেয়েতে কোনো ধরনের বৈষম্য আমি করি না। যোগ্যতা ও কাজের ভিত্তিতে আমি তাদের মূল্যায়ন করি।
- গাছ অত্যান্ত দান। আমি যখন যে সুযোগ পাব গাছ লাগাব।
- ব্যস্ততা দুশ্চিন্তা দূর করে। আমি সবসময় ভালো কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখি।
- সব সময় সবার সাথে আমার সম্পর্ক হবে সরাসরি। কাউকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করব না।

পরিশেষে উপরের প্রত্যেকটি বিষয়কে দৈনন্দিন জীবনে চর্চার মাধ্যমে জীবনকে সুন্দর করে তোলা সম্ভব, সম্ভব এ বিষয়গুলোকে নিয়ন্ত্রন করা। সর্বপরি আরো কিছু বিষয়কে এর সাথে যুক্ত করা নিজের কর্মোদ্দীপনাকে বৃদ্ধি করা। পাশাপাশি চারটি বিষয়কে মনে গেঁথে ফেলা ও চর্চা করা:

- Make it easy.
- Be respect full.
- Be inspiring.
- Keep promises

লেখক : প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা (পুলিশ), বাংলাদেশ সচিবালয় নিরাপত্তা, (এডিসি, ডিএমপি, ঢাকা)

আয়কর : চলুন একটু হাসি

তাপস কুমার চন্দ

Laughter is the best medicine আমরা জানি হাসি নাকি অনেক রোগ সারায়। হাসার কারণে মস্তিষ্কের বিশেষ এক রাসায়নিক পদার্থ মানুষকে ভালো অনুভূতি দেয়। এটি একধরনের ব্যায়ামও বটে। এতে শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত ঘটে, শরীরের পেশি ব্যবহৃত হতে কাজ করে এবং হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস ভালো রাখতে সাহায্য করে। আপনি যদি কোনো কিছু নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন বা ভয়ের মধ্যে থাকেন, তাহলে হাসি তা দূর করে দিতে পারে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, মানুষের ইমিউন (যা শরীরকে সহায়তা করে রোগ প্রতিরোধ করতে) ব্যবস্থা ভালো রাখতে সহায়তা করে হাসি। খোশমেজাজে রাখা ও ব্যথা দূর করে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখতেও হাসির বিকল্প নেই। যেহেতু আয়কর বিভাগে চাকরি করি, তাই আয়কর নিয়েই না হয় চলুন একটু হাসার চেষ্টা করি।

একটি গল্প দিয়ে শুরু করা যাক।
এক ব্যক্তি এলাকায় সবেমাত্র রেস্টুরেন্ট ব্যবসা চালু করেছেন, ব্যবসা ভালোই চলছে।
একজন খাওয়া শেষে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে বললেন, 'মুরগির মাংসটা তো বেশ খেলাম। নরম আর সুস্বাদু।'
'হবে না কেন স্যার, নিজের ফার্মের পোষা মুরগি তো! ডেইলি কাজু বাদাম, কিসমিস, প্রোটিনেক্স...কত কী খাওয়াই।'
'কি! মুরগিকে কাজু বাদাম, কিসমিস! ব্ল্যাক মানি রাখার আর জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না বুঝি?' কাস্টমার রাগত স্বরে বললেন।
একটু আগেও যিনি তৃপ্তির ঢেকুর তোলা ভদ্রলোক ছিলেন এখন খেয়েদেয়ে রাগ করে কিসব বলে চলে গেলেন।
সপ্তাহ না পেরোতেই কর ফাঁকির দায়ে নোটিশ এলো ইনকাম ট্যাক্স অফিস হতে।
কদিন বাদে আরেকজনও মুরগি খেয়ে খুব খুশি, 'বাহ! পোষা মুরগি বুঝি? তা কী খাওয়ান এদেরকে?'
হোটেল মালিক এবার সাবধান হয়ে গেছেন, 'আজ্ঞে, ভালো কিছু তো আর খাওয়াতে পারিনা, ওই পোকামাকড়, আরশোলা এসবই খাওয়াই।'
'কি? মুরগিকে পোকামাকড় খাওয়ান? জানেন আমি Prevention of cruelty to eatable birds-এর প্রেসিডেন্ট। আপনার ভিটেয় মুরগির বদলে ঘুঘু চড়বে, বলে রাখলাম।'

কদিন বাদে আরেক কাস্টমারের একই প্রশ্নে রেস্টুরেন্ট মালিকের সোজা সাপ্টা জবাব, 'একদম বলতে পারবোনা স্যার। সকালে প্রত্যেক মুরগির হাতে এক টাকা করে দিয়ে দিই। কে কী কিনে খায় জানি না।'

বলছিলাম ইনকাম ট্যাক্স নিয়ে হাসাহাসির কথা। ট্যাক্স হাসির বিষয় নয় বরং কারো কারো মতে আয়করের সমার্থক বাংলা শব্দ নাকি জটিল, কঠিন, দুর্বোধ্য, প্যাঁচালো আরো কত কী!! আসলেই কি বিষয়টি এতটা জটিল, কঠিন, দুর্বোধ্য? না আমরা জানতে চাই না।

না জানলে ক্ষতি নেই - ইংরেজি শব্দ Tax এসেছে ল্যাটিন শব্দ Taxarey থেকে, যার বাংলা অর্থ 'ধারালোভাবে স্পর্শ করা।' Tax যে ধারালোভাবে স্পর্শ করে, সে ব্যাপারে কি কারো মনে কোনো সন্দেহ আছে?
আসুন পুরোনো গল্পটি আরেকবার শুনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে গিয়ে জনৈক ফরাসি পর্যটক তাদের জাতীয় পতাকায় লাল, সাদা ও নীল বর্ণের সমাহারকে তাঁরা কীভাবে দেখেন তা এক আমেরিকানকে ব্যাখ্যা করছিলেন -'আমাদের পতাকা হচ্ছে আমাদের ইনকাম ট্যাক্সের প্রতীক!!! আমরা যখন ইনকাম ট্যাক্স নিয়ে কথা বলি- লাল হয়ে যাই; যখন ট্যাক্সের নোটিশ পাই- সাদা হই;

আর নীল হই যখন সেই নোটিশ অনুযায়ী বিল পরিশোধ করি।' শুনে আমেরিকান ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি যা বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পেরেছি। তবে বাস্তবতা হলো আমাদের অবস্থা আরো খারাপ, আমরা ট্যাক্সের নোটিশ পেলে তারাও (star) দেখতে পাই।' আয়করের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে দিনে তারা দেখে আমেরিকানরাও। আয়কর বিভাগের কি এতই শক্তি!!!
আর ট্যাক্সের নোটিশের ভয়ে শুধু আমেরিকানরা বা ফরাসিরাই কাঁপেননা, ব্রিটিশরাও যে কী পরিমাণ ভীতসন্ত্রস্ত থাকে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় এমন একটি ঘটনা শোনাই।

বিখ্যাত ব্রিটিশ লেখক কনরাডকে 'স্যার' উপাধি দেওয়া হলো, যথারীতি সেই সংবাদ সংবলিত সরকারি পত্রটি তাঁকে ডাকযোগে প্রেরণ করা হলো। তিনি নাকি বেশ কিছুদিন যাবৎ উক্ত চিঠি খুলেই দেখেননি। কারণ কি - জনশ্রুতি আছে যে, পত্রটি আয়কর বিভাগ থেকে এসেছে এটা মনে করে তিনি খুলেননি। আয়কর বিভাগের চিঠি মানেই তখন আতঙ্ক!!!

২৮তম বিসিএসের একজন গর্বিত সদস্য হিসেবে ২০১০ সালে আয়কর বিভাগে যোগদান করি। যোগদান পরবর্তী বিসিএস কর একাডেমিতে বিভাগীয় প্রশিক্ষণে শোনা গল্পটি শোনাই এবার।

পাড়ার এক ব্যায়্যামবীর পালোয়ান পেশিশক্তি জাহির করার জন্য এক প্রতিযোগিতার আয়োজন করল।

প্রথমে একটা লেবুকে চিপে সমস্ত রস বের করে একেবারে ছিবড়ে বানিয়ে ফেলল। তারপর ঘোষণা দিল, কেউ যদি এই লেবুকে চিপে এক ফোঁটা রসও বের করতে পারে, তবে তাকে নগদ ১০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। যত ফোঁটা বের করতে পারবে, তত হাজার টাকা পুরস্কার। অনেক শক্ত সমর্থ যুবক অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু কেউ পারল না। শেষে আসলেন এক বুড়ো থুথ্থুড়ে দাদু। তিনি এসে লেবু নিংড়ে দশ ফোঁটা রস বের করলেন। সবাই তো দারুণ অবাক। কড়কড়ে দশ হাজার টাকা পকেট থেকে বের করতে করতে পালোয়ান বলল, দাদুর তো অনেক শক্তি। জোয়ান কালে কি পালোয়ান ছিলেন নাকি?

দাদুর জবাব– না রে ব্যাটা, ইনকাম ট্যাক্সের অফিসার ছিলাম!

সব দেশেই সরকারের কর বিভাগ মানুষের কাছে অজনপ্রিয়। খাজনা কে কবে হাসিমুখে দিতো? কর প্রদান সম্পর্কে বিশ্বের বহু বরেণ্য ব্যক্তি বেশ কিছু মজার কথা বলেছেন, চলুন অন্তর্জালের সুবাদে একটু ঢু মারি আর জেনে নিই কি বলেন তাহারা।

'এই পৃথিবীতে মৃত্যুও ট্যাক্স ব্যতিরেকে আর কিছুরই নিশ্চয়তা নেই।'–বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন বলেছেন।

'গরিব হওয়ার সবচেয়ে বড় সুবিধে হলো, আপনাকে করের বোঝা বইতে হচ্ছে না;' ইত্যাদি ইত্যাদি।

কৌতুকময় বাণী– A fine is a tax for doing wrong and a tax is a fine for doing well.

আয়করের ফরম যাকে আমরা রিটার্ন বলে থাকি তা প্রতি বছর ৩০ নভেম্বর এর মধ্যে জমা করতে হয়। এ দিনটিকে Tax Day হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আয়করের রিটার্ন ফরম পূরণ করতে সবাই গলদঘর্ম। ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। অবস্থা এমন যে, এটা বাড়ায় টেনশন, টেনশন কত রোগের জন্ম দেয় সে আর বলতে। (টেনশন/স্ট্রেস থেকে মুক্তির উপায় সম্পর্কে জানতে এ স্মরণিকাতে প্রকাশিত আমাদের বন্ধু রাজীব দাস, বিসিএস(পুলিশ) এর নিবন্ধটিতে চোখ রাখুন)

আমেরিকা তো ধনীদের দেশ। সে দেশেও আয়করের ব্যাপারে ঠাট্টাচ্ছলে বলা হয়, আয়কর ফরম পূরণ করা খুব সহজ; ওটাতে আছে মাত্র তিনটে ভাগ: ১. গত বছর কত উপার্জন করেছেন, ২. তন্মধ্যে কত উদ্বৃত্ত আছে, ৩. ওটা সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিন।

ব্রিটিশরা এদিক দিয়ে আরো একটুখানি এগিয়ে; ওঁরা বলে, 'আমাদের আয়কর ফরমে মাত্র দুটো কলাম: ১. আপনার আয় কত ও ২. অনুগ্রহপূর্বক সেটা আমাদের প্রেরণ করুন।'

উৎসবমুখর পরিবেশে আয়কর মেলা, আয়কর সপ্তাহ, করদাতাদের সাথে রাজস্ব সংলাপ ইত্যাদি কার্যক্রমদেশব্যাপী পরিচালিত হওয়ায় করদাতারা এখন আর আতংকিত তো নয়ই বরং নিজ উদ্যোগে আয়কর প্রদানে সচেষ্ট।

আমেরিকার ঘটনা (কোন দেশ, কোন শহর এসব জেনে কার কি লাভ!!!! হাসলেই হলো) রাস্তায় এক বাচ্চা ছেলে খেলা করার সময় বেখেয়ালে হঠাৎ একটি কয়েন গিলে ফেলে। কয়েন গলায় আটকে গেলো। ফলাফল- ছেলের দম বন্ধ হয়ে হাঁসফাঁস অবস্থা, মারা যাওয়ার উপক্রম, আতংকিত মায়ের কান্নাকাটি শুরু , প্রতিবেশী ও পথচারীদের অ কুস্থলে জড়ো হওয়া সবকিছুই

হলো। ডাক্তার আসার আগে নিজেদের চেষ্টা কয়েন বের করার। কাজ হলোনা, সব ব্যর্থ।

ভিড় ঠেলে একজন এগিয়ে এলেন। দেখি তো বলে ছেলের পিঠে কয়েকটি কিল দিতেই মুদ্রাটা কাশির সঙ্গে বেরিয়ে এল।

'থ্যাংক ইউ, ডক্টর', ছেলেটির মা আবেগে কেঁদে কেঁদে বললেন। 'আমি তো ডাক্তার নই', কিলমারা (!!!) ভদ্রলোক জানালেন, 'আমি অভ্যন্তরীণ রাজস্ব বিভাগে (Internal Revenue Service) কাজ করি।'

কয়েকটি অণু-কৌতুক দিয়ে শেষ করতে চাই।

১. বন্ধু: আজ তোর ধন-সম্পত্তির বেশ তারিফ করে এলাম।
ধনীবন্ধু(বেশ খুশি হয়ে)ঃ তাই নাকি? কার কাছে?
বন্ধুঃ ইনকাম ট্যাক্সের অফিসারের কাছে!!!!

২. ইনকাম ট্যাক্সের লোকজন এক সিনেমা প্রযোজকের বাড়িতে হানা দিয়েছে।
সেকি!! আমরা ছোটখাটো প্রডিউসার। সাদাকালো ছবি বানাই। হঠাৎ আমাদের দিকে নজর কেন, স্যার???
'সেটাই বুজইতে আমরা এসেছি– কতটা সাদা আর কতটা কালো!!!'

৩. এক তেলের দোকানে ইনকাম ট্যাক্সের লোক আসবে শুনে দোকানের মালিক কর্মচারীকে ডেকে বললেন, '৫০ টিন তেল মাটির নিচে লুকিয়ে রাখো।'
দুই ঘণ্টা পর কর্মচারী এসে মালিককে বলল, 'স্যার, ৫০ টিন তেল মাটির নিচে লুকিয়ে ফেলেছি, এখন তেলের খালি টিনগুলো রাখব কোথায়?'

সরকারের অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আদায়ের অন্যতম উপায় আয়কর সংগ্রহ/আদায়। একটি দেশের জনগণের জীবনমানসহ অন্যান্য যে সকল উন্নয়নমূলক সেবা/কাজ জনগণের নিকট পৌঁছানো হয় এবং সে উদ্দেশ্যে সরকারের যে বিশাল কর্মযজ্ঞ প্রতিনিয়ত পরিচালিত হচ্ছে তার মূল চালিকাশক্তি হলো রাজস্ব। আমরা সবাই নিজ নিজ অবস্থান হতে সঠিতভাবে আয়কর প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় কার্যক্রমে সহযোগিতা করলে দেশ এগিয়ে যাবে। আমাদের আর পিছিয়ে পড়ার কোনো সুযোগ নেই। জয় হোক বাংলাদেশের।

তথ্য সূত্র: ১. অন্তর্জাল

লেখক: উপকর কমিশনার, কর অঞ্চল-৪ ঢাকা

উপবন এক্সপ্রেস

মোঃ গালিব হোসেন

ট্রেনটি যখন ভৈরব স্টেশনে থামল, তখন রাত প্রায় বারোটা। বাইরে হকারদের চেঁচামেচি, যাত্রীদের কোলাহল, চা ওয়ালাদের 'অ্যাই চ্যা গ্র্যাম' ডাক, কোনোটাই প্রত্যয়ের কানে পৌঁছচ্ছে না। আকাশে বড় থালার মতো চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে সে। না, সে চাঁদের জ্যোৎস্না ঝরাও দেখছে না। তার দৃষ্টি এবং মনের সীমানা যে এক জায়গায় এসে মেলেনি তা তার দিকে তাকালেই বোঝা যায়। পুলিশ প্রত্যয়কে হন্যে হয়ে খুঁজছে। আর পুলিশের চোখ ফাঁকি দিতেই সে রাজধানী ছেড়ে সিলেটে এক বন্ধুর বাড়ির দিকে রওনা দিয়েছে। তার বন্ধু আসাদ ব্যাংকে চাকরি করে। ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় একই মেসে থাকত। বিশ্ববিদ্যালয়ে দুজন দুই বিভাগে পড়লেও তাদের নিখাদ বন্ধুত্ব এখনো অটুট। আসাদরা দুই ভাইবোন। বোন উচ্চমাধ্যমিকে পড়ে। চার-পাঁচ বছর আগে প্রত্যয় একবার এসেছিল আসাদদের বাড়িতে। আসাদের মায়ের যত্ন-আত্তির কথা এখনো ভুলতে পারেনি প্রত্যয়। ওদের দুই ভাইবোনের ঝগড়া আর খুনসুটির কথা এখনো মনে আছে ওর। জবা ওর ভাইয়ের বিরুদ্ধে হাজারটা নালিশ করত প্রত্যয়ের কাছে। প্রত্যয় মুচকি মুচকি হাসত। মনে মনে ভাবত, ইস, আমার যদি এমন একটা মিষ্টি ছোট বোন থাকত!

পুলিশ ট্রেস করে ফেলতে পারে– এই ভয়ে মোবাইল ব্যবহার করছে না প্রত্যয়। তাই আসাদকে জানানো হয়নি। পথঘাট যেহেতু সব চেনা-তাই পৌঁছাতে কোনো সমস্যা হবে না। হঠাৎ করে ওকে দেখে নিশ্চয়ই ওরা খুব খুশি হবে!

উপবন এক্সপ্রেস ছুটছে। বিপরীত দিকে ছুটছে চাঁদ। জানালার বাইরে এখন শুধু গাছের সারি আর ছায়ার অন্ধকার। ট্রেন চলার শব্দ হচ্ছে ঝুম ঝুম-ঝুমমার! খুব ভোরে সিলেট স্টেশনে পৌঁছে যায় প্রত্যয়। একটা ব্যাটারিচালিত রিকশা নিয়ে রওনা হলো সে। সময় একটু বেশি লাগলেও অসুবিধা নেই। আগেরবার যখন এসেছিল এই পথটা খুব ভালো লেগেছিল প্রত্যয়ের।

ভোর ছয়টায় প্রত্যয় পৌঁছে যায় আসাদদের বাড়িতে। সে যে পালিয়ে বেড়াচ্ছে তা কোনো ভাবেই বুঝতে দেয়া যাবে না। খুব স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করে প্রত্যয়। জবা এসে দরজা খুলে দেয়। মলিন চেহারা। দেখে মনে হচ্ছে কত দিনের রোগা। প্রত্যয়ের দিকে তাকিয়েই ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে জবা। কান্না সংবরণ করতে চেষ্টা করে। ওড়না দিয়ে চোখ ও মুখ ঢেকে ভেতরে চলে যায়। প্রত্যয় বুঝতে পারে না। কিছুটা ভ্যাবাচ্যকা খেয়ে যায়। পরক্ষণেই এগিয়ে আসে আসাদের আম্মা। প্রত্যয়ের দিকে একনজর তাকিয়েই চিনতে পারে ওকে। কিন্তু ততক্ষণে কান্নার ঢেউ ছড়িয়ে যায়। প্রত্যয়কে জড়িয়ে ধরে বিলাপ করে কাঁদতে থাকে আসাদের আম্মা। জবার চোখে জল ঝরছে। কিন্তু কোন শব্দ নেই। বোঝা যাচ্ছে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে অপরকে সান্ত্বনা দেয়ার প্রাণান্ত চেষ্টা চালাচ্ছে মেয়েটি।

প্রত্যয় যা বোঝার বুঝে ফেলে। তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুটি আজ আর নেই। যে কিনা প্রায় প্রতি মাসে প্রত্যয়কে টাকা ধার দিত, যে তাকে প্রতি মাসে বাড়ি থেকে সাতকড়া দিয়ে মাংস রান্না করে নিয়ে খাওয়াতো- সে বন্ধুটি তার আর নেই। মনে আছে একবার মেসে প্রত্যয়ের অনেক জ্বর হয়েছিল। আসাদ সারারাত জেগে তাকে সেবা করেছিল, মাথায় পানি ঢেলেছিল, নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে তার জন্য ঔষধ আর ফলমূল এনে দিয়েছিল- সেই বন্ধুটি তার আজ নেই। কী হয়েছিল আসাদের? কীভাবে আসাদ সবাইকে ছেড়ে চলে গেল? মা মেয়ে দুজনেই কাঁদছে। কিছু জিজ্ঞাসাও করা যাচ্ছে না।

কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার পর আসাদের মা বললেন- ব্যাংকের হেড অফিসে এক সপ্তাহের ট্রেনিংয়ে গিয়েছিল আসাদ। তখন ঢাকাসহ সারাদেশে চলছিল হরতাল। তবু শেষদিন একটা লোকাল বাসে শাহবাগের দিকে যাচ্ছিল এলিফ্যান্ট রোড থেকে কিছু কেনাকাটা করার জন্য। হঠাৎ বাসে পেট্রোল বোমা ছুড়ে মারে– আসাদের মা আর কিছু বলতে পারে না। তার চোখের পানি শুকিয়ে গেছে। কান্নার শব্দের পরিবর্তে তার গলা থেকে একধরনের গোঙানির শব্দ বের হয়। জবা জানায়, ভাইয়ের লাশ তারা ঢাকা মেডিক্যাল থেকে সংগ্রহ করেছে।

আঁতকে ওঠে প্রত্যয়। হঠাৎ করে মনে হয় তার বুকের ওপর কেউ পাথর ছুড়ে মারছে। তার নিঃশ্বাস ঘন হয়ে আসে। তাহলে কি

আসাদের খুনি সে নিজেই? বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে একটি সিট পাওয়ার জন্য প্রথম রাজনীতি শুরু করে প্রত্যয়। তারপরও অনার্স-মাস্টার্সে ভালো ফল করে সে। পাস করার পর দলে একটা বড় পদের জন্য পারফরম্যান্স দেখানোর সুযোগ খুঁজে। অবশেষে সেদিন হরতালে একটি বাসে পেট্রোল বোমা ছুড়ে মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায় প্রত্যয়। কী ঘটেছিল জানে না সে। পরের দিন পত্রিকায় খবর বেরোয় অগ্নিদগ্ধ হয়ে তেরোজনের প্রাণহানি। আর চিন্তা করতে পারে না প্রত্যয়। নিথর হয়ে প্লাস্টিকের চেয়ারটাতে বসে থাকে সে। কতক্ষণ এভাবে বসে থাকে সে জানে না। শীতের সকালেও তার শরীর থেকে ঘাম ঝরতে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে জবার ডাকে সংবিত ফিরে পায় প্রত্যয়। জবাকে অনুসরণ করে খাবার টেবিলে গিয়ে বসে সে। রুটি হাত দিয়ে ধরতে কষ্ট হচ্ছে প্রত্যয়ের। তার আঙুলগুলো শক্ত হয়ে আসছে।

জবা আস্তে আস্তে বলে, খুনিরা কি কখনো শাস্তি পাবে না ভাইয়া? কেউ কি ধরা পড়বে না? কোনো উত্তর দেয় না প্রত্যয়। এক-দুইবার রুটি মুখে দেয়। মনে হচ্ছে শক্ত কোনো গাছের ছাল চিবোচ্ছে সে।

সারাদিন ঝিম মেরে বসে তাকে প্রত্যয়। জবা একটি মেয়ের ছবি এনে দেখায় প্রত্যয়কে। এই মেয়েটির সাথে ভাইয়ার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। মেয়েটির ফ্যামিলি লন্ডনে থাকে। গত সপ্তাহেই কেবল দেশে এসেছে বিয়ের জন্য। বলেই চোখ মুছে। সন্ধ্যার একটু পরে বিদায় নেয় প্রত্যয়। না, এখানে লুকিয়ে থাকা নিরাপদ না। যেকোনো সময় বিপদ ঘটতে পারে। আসাদের মায়ের পা ছুঁয়ে সালাম করে সে। কী যেন বলতে চায়। না, তার কণ্ঠে কোনো শব্দ সৃষ্টি হচ্ছে না।

ঢাকাগামী ট্রেনে চেপে বসে প্রত্যয়। ট্রেন চলছে। চাঁদটা আজ একটু ছোট। অন্ধকার দুই পাশ। তবু টিলা আর চা বাগানের অস্তিত্ব বোঝা যায়।

রাত গভীর হচ্ছে। চাঁদ ট্রেনের গতির কাছে হার মেনে লুকানোর চেষ্টা করছে। চোখ বুঝে জানালা খুলে বসে আছে প্রত্যয়। ঠাণ্ডা বাতাস। পাশের যাত্রীর অনুরোধেও বন্ধ করেনি জানালা। কী সব আকাশ-কুসুম চিন্তা আসছে তার মাথায়। টপ লেবেলের একটা পদ পাবে তো সে! আবার চিন্তায় আসছে জবা আর আসাদ। চার-পাঁচ বছর আগে যখন এসেছিল। দুই ভাইবোন ঝগড়া করে আসাদ বলল– তোকে বিয়ে দিয়ে দেব– আর বিয়ের পরে তোর শ্বশুরবাড়ি থেকে আমি তোকে আর আনতে যাবনা। শুনে জবা বলেছিল, তুমি না আনলে কি হবে, প্রত্যয় ভাইয়া ঠিকই আমাকে নিয়ে আসবে। আসবে না প্রত্যয় ভাইয়া তুমি? প্রত্যয় মুচকি হেসে বলেছিল– হ্যাঁরে, আসাদ না আনলে কী হবে আমি তোকে নিয়ে আসব।

প্রত্যয়ের শরীর কেমন যেন কাঁটা দিয়ে উঠছে। সে বাইরে তাকানোর চেষ্টা করল। না- ট্রেনটা এখন চলছেনা। একটু পর আবার একটা ট্রেনের হুইসেল শুনে বোঝা গেল ক্রসিং হবে, তাই থেমে আছে।

প্রত্যয় ঠাই তাকিয়ে আছে সামনের দিক থেকে এগিয়ে আসা একটা আলোর দিকে। ক্রমেই কাছাকাছি আসছে। আরো কাছে আসছে আলোটা বিকট শব্দ করে। হঠাৎ প্রত্যয় ঝাঁপিয়ে পড়ল আলোর দিকে। পাশ থেকে কেউ কিছু বুঝতে পারল না। শুধু একটা আর্তনাদ মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

প্রত্যয়ের মাথাটি দ্রুতগামী ট্রেনের এক পাশে পড়েছে। তার সবকিছু অনুভূতিহীন। একধরনের ঘোর কাজ করছে। মনে হচ্ছে প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে শুয়ে আছে সে, আর আসাদ তার মাথায় পানি ঢালছে। আবার মনে হচ্ছে জবার খিলখিল হাসির শব্দ ভেসে আসছে।

দুটি ট্রেন চলে গেল দুই দিকে। একটি থেঁতলে যাওয়া দেহ পড়ে রইল রেললাইনে। আশপাশ পুরোটাই বুনো পরিবেশ। ঝিঁঝি পোকার ডাক। একটা পেঁচা ভয়ার্ত সুরে ডাকছে গাছের ডালে বসে। চাঁদের আলোও একসময় ঢাকা পড়ল ঘন কুয়াশায়।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান বিভাগ, সরকারি তিতুমীর কলেজ, ঢাকা

ফেসবুক প্রেগন্যান্সি

যাকিয়া সুলতানা নীলা

প্রেগন্যান্ট হবার পর থেকেই আমি ফেসবুকে সময় বাড়িয়ে দিয়েছি। মেয়েদের আর বাচ্চার মাদের গ্রুপে আমার নিয়মিত সরব পদচারণা। মাসে একটি মেডিকেল চেকআপে গেলেও ফেসবুকে প্রেগন্যান্সির নানা মেডিকেলীয় (??) উপদেশ পাওয়া যায়। পেজগুলো কত ভালো (??) আর আপুরা কত আন্তরিক!!! তবে এদের উপদেশ শুনে আমার বাচ্চা এবরশনের উপক্রম হয়েছিল বলে ডাক্তার রা মনে করেন। পরে তারা আমাকে সম্পূর্ণ বেড রেস্ট করে এমনকি আমাকে দুই মাস হাসপাতালেও থাকতে হয়েছে। আমার বর তো বোঝে না সব ডাক্তারদের টাকা নেবার ফন্দি। ফেসবুকের আপুরা কত অভিজ্ঞ আর পেজগুলোর অ্যাডমিনরা কত ভালো আর হেল্পফুল। আর ডাক্তাররা কি জানে?? স্ট্রিপ টেস্ট-এর ছবি পোস্ট করার পরেই একজন বলল, বোন দিনে ৩ ঘণ্টা হাঁটবে, আরেকজন বলল দিনে তিনবার চেয়ার থেকে লাফ দেবে, একজন বলে আলু পুড়িয়ে ধোঁয়া নেবে, আরেক আপু বলেছে রুমে লোহার কড়াই রাখতে তাতে দুই ঘণ্টা পর পর পানি দেবে। এসব না করলে ডাক্তাররা সিজারিয়ান করে বাড়তি টাকা হাতিয়ে নিতে পারে। কিন্তু বেকুব ডাক্তার বলে বেশি পরিশ্রমে নাকি স্পটিং না কী হয়েছিল। দিল এক মাসের বেড রেস্ট। প্রতি সাত দিনে চেকআপ। আপুরা বলেছে এসব কিছু না। মরিচের ধোঁয়া নিলেই নাকি পেট টাইট হয়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু আমার বর কোনোভাবেই এসব মানে না। ডাক্তার যে তাকে কী জাদুটোনা করেছে কে জানে?? ডাক্তার সনোগ্রাফি দিত। আপুরা বলেছে সনোগ্রাফি করে নাকি ডাক্তাররা বাচ্চার মধ্যে কী যেন দিয়ে দেয় যেন সারা জীবন ডাক্তারের কাছে যাওয়া লাগে। কিন্তু আমার বেকুব বর সনোগ্রাফি করাবেই। বাচ্চা নড়াচড়া শুরু করার পর আপুরা বলে গ্লাসে পাথর নিয়ে নাড়াতে। পানিতে দিনে তিনবার পাথর নাড়ালে বাচ্চা ভালোমতো নড়বে। দিন বাড়ার সাথে সাথে আপুরা কত কী খেতে বলল। ভোরে পোড়া লবণ, সকালে চিনির শরবত, দুপুরের বেগুনের শরবত, বিকালে সোনার পানি আর রাতে কাঠ ছোঁয়া। বর তো এসব মানে না। ডাক্তার তো এসব শুনে হেসেই গেল। আমি বরকে বললাম ডাক্তার বদলাব। কিন্তু সে রাজি নয়। উল্টা আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করতে বলে। শেষে তো ঝগড়াই হলো আমাদের। তাতে কী? আমি ফেসবুক ছাড়ব না। আপুরা বলেছে অনলাইনে পাওয়া ফুলটা কিনে এনে বাসায় ভিজিয়ে রাখতে। যেদিন ফুল ফুটে উঠবে সেদিন নাকি বাবু ডেলিভারি হবে। কিন্তু এত ফুল ভেজানোর পরেও পেইন আসছে না। বর বিরক্ত আমার কাণ্ডে। যা ইচ্ছা ভাবুক। শেষে একবারে বাবুর নড়াচড়া কমে আসছে। আপুদের বললাম। আপুরা বলল হাঁড়িতে পাথর নিয়ে নাড়াচাড়া করতে, সেভেনআপের বোতল এনে বার বার ঝাঁকিয়ে ওভার ফ্লো করে উপরে গুলি ফেলে নিচের সেভেনআপ খেতে, আরেকজন বলেছে শুধু ডিম ভাঙতে ছুড়ে ছুড়ে। বর হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার বলে ইমার্জেন্সি সিজারিয়ান লাগবে, নইলে বাচ্চা খারাপ হয়ে যাবে। আপুরা বলল রাজি না হতে, মোটা ফিতে পেটে টাইট করে বেঁধে মিনিটে ১০টা জাম্প করলে নাকি এমনিতেই বাচ্চা হয়ে যাবে। এবার আমার বর আছাড় দিয়ে মোবাইলটা ভেঙে দিল। আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট নাকি আমার মাথা নষ্ট করেছে। যারা না দেখে না জেনে আমাকে এত উপদেশ দেয় তাদের কিনা সে ভুল বুঝল?? শেষে বরের কান্নাকাটিতে কনসেন্ট দিলাম। সিজারিয়ান করে ফুটফুটে একটি ছেলে হয়েছে আমার। আমার বরকে আতঙ্কিত দেখাচ্ছে। আমার মাকে অনুরোধ করছে আমাকে যাতে ভালো মনোচিকিৎসক দেখানো হয়। আমি অবশ্য প্রেগন্যান্সি ব্লুর পোস্ট দেখিয়ে সবাইকে থামিয়ে দিলাম।

লেখক: বিসিএস স্বাস্থ্য, মেডিকেল অফিসার, জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা।

ভালবাসার বন্ধন

সাজেদুর রহমান

সময়ের লাগাম যদি টেনে ধরা যেত! অনন্তকাল ধরে বয়ে চলেছে সময় ও স্রোত, চলবে একইভাবে। নাসিম বিছানায় শুয়ে সাইড টেবিলে রাখা মোবাইল ফোনে সময় দেখে। সাতটা ত্রিশ। প্রতিদিন সকাল সাড়ে আটটায় অফিসের উদ্দেশ্যে সে বাসা থেকে বের হয়, অফিস শুরু হয় সকাল নয়টায়। নাসিমের বাসা ঢাকার ইস্কাটন গার্ডেনে আর অফিস মতিঝিলে। সে একটি প্রাইভেট কোম্পানির মার্কেটিং ম্যানেজার, বেতন আশি হাজার, বেতন ছাড়াও কোম্পানি তাকে অফিসে যাওয়া আসার জন্য একটি কারের বন্দোবস্ত করেছে। নয়টা পাঁচটা অফিস নাসিমের, শুক্রবার বন্ধ। প্রতিদিন সকাল সাতটা ত্রিশে ঘুম ভেঙ্গে যায়, অভ্যাস হয়ে গেছে তাই এলার্ম দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না আর। মোবাইলে সময় দেখে আবার বালিশে মাথা রাখে নাসিম। ওদের তিনজনের সংসার। নাসিমের স্ত্রী শারমিন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর পাস করে গৃহিনী। স্বামী ও স্ত্রীর বয়সের পার্থক্য ছয় বছর। নাসিমের তেত্রিশ চলছে। নাসিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাকেটিং-এ স্নাতকোত্তর পাস করে এ কোম্পানিতে যোগদান করেছিল। তার অনেক বন্ধু বিসিএস কিংবা অন্য সরকারি চাকরিতে যোগ দিয়েছে কিন্তু তার নিজের সরকারি চাকরিতে আগ্রহ ছিল না। আট বছর ধরে সে একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত, অন্য অনেক প্রাইভেট কোম্পানিতে সে চাইলে যেতে পারে কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানে সুযোগ-সুবিধা খারাপ না তাই অন্য কোথাও তার যাওয়া হয়নি। সাতাশ বছর বয়সে পারিবারিক সম্মতিতে বিয়ে করে নাসিম, শারমিন তখন তৃতীয় বর্ষে পড়ত, বিয়ের পর থেকে ওরা ইস্কাটন গার্ডেনে থাকে। শারমিন মেয়েটি বেশ ভালো, সরল আর স্বামী ভক্ত খুউব। শারমিনের চোখে নাসিম চমৎকার একজন মানুষ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ আর ভালবাসা যায় এমন একজন স্বামী। ওদেরকে দেখলে পুরোপুরি সুখী দম্পতির একটি ছবি যে কেউ দেখতে পাবে। নাসিমের জীবনে কোন প্রেমিকা ছিল না, ছাত্র জীবনে লেখাপড়া করার বাইরে আর কিছুকে সে প্রাধান্য দেয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন হল আর লাইব্রেরিতে ছিল যাতায়াত, বিকেলে দুইটি টিউশনি। তার সহপাঠী অনেকে প্রেম করত কিন্তু তার সাহস ছিল না, কেমন যেন শরীর কাঁপত। তার শ্বশুরবাড়ী গাজিপুর হলেও তারা এখন ঢাকায় স্থায়ী হয়েছে। শারমিনদের নিজেদের ফ্ল্যাট মগবাজারে, সেই সূত্রে তার লেখাপড়ার পুরোটাই ঢাকাকেন্দ্রিক। ভিকারুননিসা থেকে পাশ করে যখন সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারেনি তখন খুব কেঁদেছিল শারমিন কিন্তু ঢাকার বাইরে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে তার কিংবা তার পরিবারের সম্মতি ছিল না, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীতে ভর্তি হয়েছিল শারমিন। লেখাপড়া শেষ করার আগে বিয়ে করার ব্যাপারে খুব বেশি আপত্তি তার ছিল না বরং সে ভেবেছিল ছেলেটি যদি ভাল হয় তাহলে ব্যাপারটি অনেকটা প্রেম করার বৈধ অনুমতি পাওয়ার মত হবে। সবেমাত্র তৃতীয় বর্ষের শুরু ছিল শারমিনের। শাড়ী পড়েছিল সে, হালকা নীল রঙের। ছেলে আর তার সাথে তিন অথবা চারজন এসেছিল সেদিন। বিয়ের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে শারমিন প্রথম কারো মুখোমুখি, স্থান তাদের মগবাজারের বাসা। নাসিমের বায়োডাটা দেখেছিল কিন্তু মুখোমুখি এই প্রথম তেমন কোন কথা সেদিন তাদের দু'জনের কেউ বলতে পারেনি। আড়চোখে কয়েকবার নাসিমকে দেখেছিল শারমিন। কিছু পুরুষ আছে যাদের কে প্রথমবার দেখলেই ভাল লাগে নাসিম ঠিক সে রকম ছিল। শারমিনের মনে হয়েছিল বিয়ে না করে বরং এই ছেলের সাথে প্রেম করলে বেশি ভাল লাগবে। প্রথম দেখায় ছেলেটির বয়স খুব বেশি লাগেনি, অনায়াসেই ছাত্র হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়া যাবে। খুব বেশি হলে সে ছেলেটির সামনে দশমিনিট ছিল।

আপনি তো শারমিন?

জি, শায়লা শারমিন।

একটু হতচকিয়ে গিয়েছিল নাসিম। বলল, লেখাপড়া শেষ করে চাকরি করার ইচ্ছা আছে?

দেখুন, ইচ্ছাতো আছে কিন্তু সময়ই সব বলে দিবে। আপনি মেয়েদের চাকরি করাটাকে সমর্থন করেন তো?

এখনতো সবকিছুতে মেয়েরাই এগিয়ে। আমি নারী ক্ষমতায়নের ভীষণ পক্ষপাতি।

শুনে ভাল লাগল। তারপর শারমিন জিগ্যেস করল, অনেকের বিসিএস ক্যাডার হওয়ার ইচ্ছা থাকে। আপনার?
সরকারি চাকরি করার ইচ্ছা আমার নেই। আমি পরবর্তীতে নিজেই কিছু করতে চাই।
ব্যবসা?
অনেক কিছু হতে পারে। আমি চাই এমন কিছু করতে যেখানে অনেকের কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা হবে। বেশ ভাল চিন্তা ভাবনা আপনার। শুভ কামনা রইল।
ধন্যবাদ।
সেদিনই ছেলেপক্ষ মেয়েকে পছন্দ হয়েছে বলে জানিয়েছিল। শারমিনের বাবা কিছুটা সময় নিয়েছিল, নাসিমের বিস্তারিত খোঁজখবর নেয়া শেষ হলে এবং সবকিছু তথ্যাদি পজিটিভ হওয়ার পর তিনি নাসিমের বাবাকে সম্মতির কথা জানিয়েছিলেন। বিয়ে হয়েছিল যখন শারমিন তৃতীয় বর্ষের মাঝামাঝিতে। বেশ জাকজমক ভাবে বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হয়েছিল শারমিন আর নাসিমের। সেই থেকে ওদের বসবাস ইস্কাটন গার্ডেনে। তারপর দেখতে দেখতে শারমিন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাস করল। বিয়ের পর মাঝে মাঝে নাসিম তার বউকে আনতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে যেত, ওর অনেকে বান্ধবী নাসিমকে শারমিনের প্রেমিক ভাবত। কাছের বন্ধুরা সবাই বিয়েতে আমন্ত্রণ পেয়েছিল, অনেক অনুষ্ঠানেও এসেছিল। যারা বিয়ের ব্যাপারটি জানত না তাদের তাই ভুল হতো বেশি। শারমিন বিষয়টা বেশি এনজয় করত। প্রতি শুক্রবার ওরা কোথাও না কোথাও ঘুরতে যেত, বেশ ছিল সময়গুলো তখন। কিভাবে যে সময় ছুটে চলে? বাঁধার কোন সুযোগ নেই। স্নাতকোত্তর শেষ হলে নাসিম একদিন বলল, এবার আমার একজন মা দরকার।
কেন, তোমার তো অলরেডি দুজন মা আছে।
মানে?
একজন গর্ভধারিনী অন্যজন শ্বাশুরী। আবার একজন মা?
জি জরুরি দরকার। এবার আর নিষেধ চলবে না।
একটু লজ্জা পেয়েছিল শারমিন কিন্তু বিয়ের তিন বছর পর স্বামী কিংবা শ্বশুরবাড়ীর লোকজন একটি সন্তান আশা করবে এটা খুবই স্বাভাবিক।
শারমিন বলল, ঠিক আছে কিন্তু তোমার মা দরকার কেন? বাবা হলে কি সমস্যা?
আমার মা-ই চাই।
একটু হাসে শারমিন। বলে, তোমাকে নিয়ে আর পারি না।
কেন? আমি এমন কি করেছি সুন্দরী?
আমি যদি বলি আমার একজন বাবা দরকার?
জানতাম, তুমি এটাই বলবে?
এভাবে মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে কথাবার্তা চলত কিন্তু একটি সুস্থ সন্তানের প্রত্যাশায় ছিল শারমিন আর নাসিম দম্পতি।
সেদিন ছিল সোমবার। নাসিম বিদেশী ডেলিগেটদের সাথে একটি মিটিংয়ে ছিল হঠাৎ শারমিনের মা তাকে ফোন করে দ্রুত বাসায় আসতে বললেন। শারমিনের ব্যথা হচ্ছিল প্রচণ্ড, নাসিম অফিসে দেরি না করে বাসায় যাচ্ছিল, শ্বশুরের বাসা থেকে ফোন করে তাকে হলিফ্যামিলি হাসপাতালে চলে আসতে বলা হলো। মগবাজারের শ্বশুরের বাসা থেকে হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের দূরত্ব খুব অল্প। বেশ টেনশন হচ্ছিল নাসিমের। গাড়ীর এসি চলছিল কিন্তু সে ঘামছিল। শারমিন অবশ্য নিয়মিত চিকিৎসকের কাছে ফলো-আপ নিয়েছে। শেষ দুই/তিনমাস সে তার বাবার বাসায় ছিল, নাসিম মাঝে মাঝে দেখে আসত, অফিস থেকে অল্প সময়ে সে হাসপাতাল পৌঁছে যায়, অপারেশন থিয়েটারের সামনে গিয়ে নাসিম শ্বশুরবাড়ীর অনেককে দেখতে পেল। সবাই উদ্বিগ্ন।
বাবা তুমি এসেছো? অপারেশন থিয়েটারে হয়ত এখনি নিয়ে যাবে।
মা, শারমিন কে একবার দেখা যাবে?
শারমিনের মা একজন নার্সকে ডাকলেন। বললেন, জামাই এসেছে। অপারেশন করানোর আগে মেয়েটাকে একটু দেখা যাবে?
আমি দেখছি।
একটু পরেই অপারেশন থিয়েটারের পোশাকে শারমিন কে নিয়ে আসে নার্সরা। একটু যেন কেঁপে উঠেছিল নাসিম কিন্তু শারমিনকে বেশ আত্মবিশ্বাসী মনে হয়েছিল।
দোয়া কর আমার জন্য
নাসিম মুখে কিছু বলতে পারেনি। কেবল তাকিয়ে ছিল।
হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে শারমিন কে নেয়ার পূর্ব মুহূর্তে একজন চিকিৎসক এসে নাসিমের লিখিত অনুমতি নিয়েছিল। শারমিনের ডেলিভারি স্বাভাবিক না হলে সিজারের সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষ নিতে পারবে অথচ আমাদের দেশের কোন হাসপাতালে নরমাল ডেলিভারির উদাহরন খুব কম, ভর্তি হলেই সিজার করতে হয়। নাসিম জানত যত কিছুই চিকিৎসক বলুক না কেন, শেষ

পর্যন্ত বলবে সিজার ছাড়া কোন না কোন সমস্যা মা অথবা শিশুর হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে অতএব কোন পরিবার ঝুঁকি নেবে? ঐ মুহূর্তে এতসব চিন্তা তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল না, কেবল সুস্থ একটি শিশু আর শারমিন যাতে ভাল থাকে এ কামনা আর দোয়া ছাড়া। টেনশনে সময় সম্ভবত একটু দ্রুত চলে যায়। স্যার, আপনি একটি ফুটফুটে সন্তানের বাবা হয়েছেন। ম্যাডাম ও বেবি দু'জন ভাল আছে।

নাসিম যে কত খুশী হয়েছিল তা কোনদিন ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। তার এই জীবনে এরকম ফুটফুটে একটি কন্যা শিশুর বাবা হওয়ার চেয়ে আর আনন্দের কোন সংবাদ ছিল না। ঐ দিনটির কথা মনে পড়লে কেন যেন চোখে পানি চলে আসে। অপারেশন থিয়েটার থেকে তোয়ালে প্যাঁচানো ছোট শিশুটির মুখখানি দেখে সবাই বলেছিল, অবিকল বাবার প্রতিচ্ছবি।

শ্বাশুড়ী বলেছিল, তোমার নতুন মা পেয়েছো নাসিম। তোমার মতই দেখতে হয়েছে। ভাগ্যবতী হবে।

শারমিন বলেছিল, আল্লাহ তোমার চাওয়া পূর্ণ করেছেন।

সত্যিই আমি অনেক খুশি। তুমি?

অনেক।

তোমার মত দেখতে হবে।

সবাই তাই বলছে। আমি এসব নিয়ে ভাবছি না।

কিন্তু কেউ বলছে না যে মায়ের মত হয়েছে।

আরে তুমি দেখবে মেয়ে আমাদের দু'জনের মত হবে।

হাসপাতালে তিনদিন থাকতে হয়েছিল শারমিনের তারপর ওর বাবার বাসায়। ঐ সময় কিছুদিন নাসিম শ্বশুরবাড়ী ছিল কারণ মেয়েকে না দেখে তার থাকাটা ছিল একরকমের অসম্ভব ব্যাপার। সাদিয়া যখন বসতে শিখেছিল তখন ওদের কত আনন্দ, যখন এক পা দু'পা করে হাঁটতে শিখছিল সে কি আনন্দ তাদের। দেখতে দেখতে মেয়েটি হাঁটতে শিখল, দিন যত যায় সাদিয়া ততই নাসিমের মতো দেখতে হচ্ছে। সকালে যখন নাসিম অফিসের উদ্দেশ্যে বের হয় মেয়েটি ঘুম থেকে উঠে বাবাকে দরজার কাছে এসে টা-টা বলে আর বিভিন্ন কালারের চকলেট নিয়ে আসতে বলে। অফিসে পুরোটা সময় মেয়েটির কথা মনে পড়ে তার, মাঝে মাঝে অবশ্য ভিডিও কল করে মেয়ের সাথে কথা বলে নাসিম। অফিস থেকে ফেরার সময়টাও মেয়ের মুখস্থ হয়ে গেছে। কলিংবেলে টিপ মারলেই ভিতর থেকে সাদিয়া চিৎকার করে বলে, আম্মি, বাবা বাবা, গেট খোলে দাও। ভিতরে পা রাখতেই ব্লু চকলেট, রেড চকলেট আরও কত কি! নাসিম যতক্ষণ বাসায় থাকে ততক্ষণ বাবার পাশে সাদিয়া। ভালবাসার দৃঢ় বন্ধনে নাসিম, শারমিন আর সাদিয়া।

সকাল সাড়ে সাতটায় ঘুম ভেঙ্গে গেলেও আরও কিছুক্ষন বিছানায় থাকে নাসিম। সাদিয়া ঘুমোচ্ছে এখনও, শারমিন উঠেছে সবেমাত্র। নাসিম মেয়েটির কপালে চুমু খায়। তার জীবনের তেত্রিশটি বসন্ত পার হয়ে গেল। এইতো সেদিন, চোখ বন্ধ করে নাসিম, চোখের পাতায় সব স্পষ্ট। দেখতে দেখতে সাদিয়ার তিন বছর পূর্ণ হচ্ছে। মনের গহীন থেকে ভালবাসা সাদিয়ার জন্য। চোখ দুটি মনে হয় সিক্ত হলো, নাসিম মেয়েটির কপালে আরেকটি চুমু দিল, বলল, শুভ জন্মদিন, মামনি। তোমার বুড়ো ছেলেটা সাড়া জীবন তোমাকে একই ভাবে ভালবাসবে। ঘড়ির দিকে তাকায় নাসিম, আপন মনে বলল, বয়ে চলো আপন ছন্দে।

সাজেদুর রহমান: অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের দিনগুলি

রাজ কামাল আহমেদ

** এক **

বিবিধ মাথার (তিন মাথা, চারমাথা, সাত মাথা, এগারো মাথা?) লীলাভুমি বগুড়া শহরে 'ল্যান্ড' করে সাতমাথা থেকে রিকশা নিলাম। গন্তব্য বিয়াম (BIAM-Bangladesh Institute of Administration & Management) ফাউন্ডেশন। উপশহরে প্রবেশ করে বিয়াম খুঁজে পেতে খাবিখাচ্ছি শুরু হয়ে গেল আমার রিকশাওয়ালার।

"ঐ মিয়া, বিয়াম চেনো না! বগুড়া শহরে রিকশা চালাও ক্যানকা করে?" বিয়াম কোথায় এটা জিজ্ঞেস করাতেই রিকশাওয়ালাকে কঠিন একটা ঝাড়ি লাগিয়ে দিলেন চা-স্টলে আয়েশি ভঙিতে পায়ের উপর পা তুলে বসে থাকা এক মুরুব্বী।
ঝাড়ি দিলেও পরে তিনি রিকশাওয়ালাকে বিয়ামের দিক নির্দেশনা দিলেন।
অবশেষে পৌঁছুলাম বিয়াম ফাউন্ডেশনে; সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হওয়ার মুহূর্তে।

রিকশা থেকে নামতেই কর্মচারী গোছের একজন পরিচয় জেনে আমার লাগেজটি নিয়ে বলল, "স্যার, চলেন আমার সাথে।" আমি রিকশাভাড়া মিটিয়ে তার সাথে সাথে চলতে লাগলাম।
বিয়াম ভবনের দোতলায় উঠে রেজিস্ট্রেশন করলাম যার কাছে স্বাভাবিক ভাবেই তিনি তখন অচেনা (সালাউদ্দিন স্যার, কোর্স সমন্বয়ক)। আমার রেজি: নং হল ০৮।
তারপর আমাকে ডরমেটরিতে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল আর একজন। আমার জন্য বরাদ্দকৃত রুম নং ২০২।

** দুই **

রুমমেট হিসাবে পেলাম ডা: আ: কাদের ভাইকে। তিনি এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে পরিচিত হলেন। ডেন্টিস্ট। কথাবার্তায় বুঝলাম তিনি টাঙাইলবাসী। আমাদের এই ৫ম ব্যাচের সবচেয়ে সিনিয়র কলিগ। ১৭তম বিসিএস এর। কালক্রমে এই মানুষটিই হয়ে উঠেছিলেন আমাদের ব্যাচের সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তি। বৌকে অসম্ভব ভালবাসেন তিনি, তদ্রূপ তার বৌও তাকে। খানিকক্ষণ পর পর বৌয়ের সঙ্গে তার ফোনালাপ এটিই প্রমাণ করে দিত। তার আর একটা বড় দিক হলো তার শারীরিক ফিটনেস, কখনো ইনজুরিতে পড়েননি তিনি। তার স্ট্যামিনার কাছে আমরা রীতিমত পরাস্ত। জগিংয়ে তিনি নিয়মিতভাবেই প্রথম সারিতে! ক্রিকেট, ফুটবলেও তার সরব উপস্থিতি।

** তিন **

প্রতিদিন ভোরে ঘুম ভাঙে স্পোর্টস ইনস্ট্রাকটর মিঠু স্যারের নিঠুর বাঁশির কঠোর শব্দে। আমরা ঘুম থেকে উঠে তড়িঘড়ি করে বিছানা ছেড়ে সাদা টি-শার্ট, সাদা ট্রাউজার পরে, সাদা কেডস পায়ে গলিয়ে মাঠে নেমে পড়ি। কিছুক্ষণ স্ট্রেচিং, জগিং, সবশেষে রানিং। উল্লেখ্য জগিং আর রানিং এর ধকল শুধু ছেলেদের উপর দিয়েই যেত! আমরা ছেলেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে প্রাণপণে দৌড়াই। অন্যদিকে মেয়ে চতুষ্টয়ী স্ট্রেচিং শেষেই অব্যহতি পেতেন। কি মজা! তারা আয়েশি ভঙিতে হেঁটে বেড়াতেন আর বাগানে দাঁড়িয়ে মনের আনন্দে বিভিন্ন ভঙ্গিতে সেলফি তুলতেন! আমরা হাপুস নয়নে তাদের কাণ্ডকীর্তি দেখতাম আর ভাবতাম নারীর ক্ষমতায়ন (ডড়সবহ উসঢ়ড়বিৎসবহঃ) নিয়ে এত কথা বলা হয়! সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, টকশো হয় ; মানববন্ধন হয়। কিন্ত এখানে এমন কেন হচ্ছে? আমরা মাথার ঘাম, চোখের জল, নাকের জল ফেলে একাকার করে দৌড়াচ্ছি; ঐদিকে নারীরা আয়েশ করে হাঁটছেন আর ফুলের বাগানে সেল্ফি তুলছেন! ব্যাপারটা তো নারীর ক্ষমতায়ন এর সঙ্গে বিরুদ্ধাচরন তাই

না?

আমি একটু ঠোঁটকাটা টাইপের, এটা আমার নিজেরও পছন্দ না। এক সকালের ঘটনা। আমরা পুরুষকুল হন্তদন্ত হয়ে দৌড়াচ্ছি, এমন সময় নারীগণ আমাদের বিপরীত দিক থেকে হেঁটে হেঁটে গালগল্প করতে করতে আমাদের অতিক্রম করছেন। দৌড়াতে দৌড়াতেই আমি আমার মেডিকেলের এক সিনিয়র আপুকে বললাম, "আপু, আমাদের সাথে দৌড়ান! উপকার হবে!"
আপু কিঞ্চিৎ রাগ এবং বিরক্তি মেশানো ককটেল মার্কা চাহনি দিয়ে ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন, "ওএমজি! তুমি জানো না? আমার ব্যাকপেইন!"
মনে মনে প্রমাদ গুণি--ঠিকই তো একই মেডিকেলে পড়তাম অথচ আপুর যে ব্যাকপেইন এটা আমার জানা নেই!!
স্যরি আপু আপনার যে ব্যাকপেইন এটা আমার মেডিকেল লাইফেই জানা উচিত ছিল।
** চার **
একেকটা মডিউল পরীক্ষা যেন একেকটা বিভীষিকা। পরীক্ষাগুলি না থাকলে ফাউন্ডেশন ট্রেনিংটা নির্ভেজাল আনন্দায়কই হত। পরীক্ষার আগের রাতে সবাই পড়ে! আমার রুমমেট আ: কাদেরভাই-ও পড়ে। আমি শুধু লেকচার শীট উল্টাই। মশার যন্ত্রনায় আমাদের মশারী টাঙ্গিয়ে মশারীবন্দি হয়ে পড়তে হত। আ: কাদের ভাইয়ের শুয়ে শুয়ে পড়ার অভ্যাস। ক্রমান্বয়ে রাত্রি গভীর হয়! একসময় আ: কাদের ভাইয়ের কণ্ঠে আফসোস ঝরে পড়ে, "কা--মা--ল! কিছুই তো পড়া হইলো না!"
তার ঠিক ত্রিশ সেকেন্ড পর আওয়াজ আসে---"ঘড়ড়ড়ড়ড়.....ফুচচচচ!
ঘড়ড়ড়ড়....ফুচচচচচ!!"

সেই সিনক্রোনাইজ নাকডাকার আওয়াজে বুঝতে পারি কাদের ভাইয়ের ট্রেডমার্ক ঘুম অলরেডি শুরু হয়ে গেছে।

** পাঁচ **
ডাইনিংয়ের ফিস্ট এর ব্যাপারে না বললেই নয়। যে রাত্রিতে ডিনার টাইমে ফিস্ট হয় সে রাত্রির ডিনারে মেয়েরা বেশ সাজুগুজু করে আসত, কেন যে করত আল্লাহ মালুম! আমার ধারণা সাজুগুজু করলে বেশি খাওয়া যায় না! কারণ খাবারের সংস্পর্শে যুগপৎ ড্রেস নষ্ট হবার ভয় এবং লিপস্টিক এবড়োথেবড়ো হবার আশঙ্কা থাকে এজন্য!
অন্যদিকে আমরা ছেলেরা ঢিলেঢালা টি-শার্ট ট্রাউজার পরিধান করে ডাইনিঙে যেতাম (এবং যথাসম্ভব পূর্বের ংহধপশং না খেয়ে) কারণ বেশি বেশি খাবার গলাধঃকরণ করে উদরপূর্তি করতে হবে এই আশায়। কিন্তু কীসের কী? যার যে পরিমান খাওয়ার অভ্যাস ফিস্টেও সেই পরিমান খাবারই পেটে ঢোকে, বেশি আর খাওয়া আর হয়ে উঠে না। বেশির ভাগ খাবারই ডাইনিং টেবিলে পড়ে থাকে। আমরা হাপুস নয়নে সব সুস্বাদু খাবারগুলো দেখি আর আফসোস করি---ওহে খাবার তুমি কাহার?

** ছয় **
স্যুভেনির সম্পাদনার দায়িত্ব পেয়েছি। কিছুদিন যাবার পর বুঝলাম কাজটি জলবৎ তরলং নয়। ক্লাস, পরীক্ষা, ল্যাবওয়ার্ক, ভিলেজ স্টাডিস, খেলাধুলা সব মিলিয়ে লেজেগোবরে অবস্থায়। স্যুভেনিরের কাজে হাত দিব সে সময় কোথায়? পোষ্টার টাঙিয়েছি, লেখা চাচ্ছি, ছবি চাচ্ছি অথচ কারো কোন আগ্রহ বা সাড়া নাই! সাড়া থাকবেই বা কোত্থেকে? আমার মত সবারই তো তথৈবচ অবস্থা।

কমিটির সদস্য ডা: জাহিদকে বললাম, 'কেউ তো লেখা আর ছবি দিচ্ছে না! কী করা যায় বলেন তো?'
তিনি বললেন, 'কী আর করবেন? সবার কাছে গিয়ে গিয়ে হাত পেতে বলেন যে যা পারেন দিয়ে দেন ভাই! দেখেন কি হয়?'

আমি ডা: জাহিদের পরামর্শ মত কাজ শুরু করলাম, সবার কাছে গিয়ে গিয়ে হাত পেতে বলতে লাগলাম, 'যে যা পারেন দিয়ে দেন, ভাই/ আপা!' তাতে কাজ হল। সহকর্মীরা সবাই কবি/সাহিত্যিক হয়ে গেল। ক্লাসের মধ্যেই তারা স্যারদের চোখ ফাঁকি দিয়ে স্যুভনিরের জন্য লিখতে লাগল।
বাহ! কি অভাবনীয় সাহিত্য প্রতিভা সবার মাঝে! লেখা চাওয়ার সাথে সাথেই লেখা বের হয়ে আসছে!! পুরাই টাশকি খেলাম।

** সাত **
এক সকালে আমার ঝঙঘণ ক্যামেরা হাতে নিয়ে মাঠে গেলাম, স্ট্রেচিংএর পোজ দিয়ে ছবি তুলতে; স্যুভেনিরে দিব। সবাইকে অনুরোধ করলাম পোজ দিয়ে দাঁড়াতে, সবাই হাত দিয়ে চুল ঠিক করে (যাদের মাথাভর্তি টাক তারাও ঠিক করল! :পি) ব্যাপক

ভাব নিয়ে দাঁড়ালেন!
শুধু বাগড়া বাধালেন তাগড়া গড়নের ডা: ডলার(ডন)। তিনি উল্টা দিকে মুখ করে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, "কামাল ভাই পোজ দিছি! ছবি তুলেন!"
আমি বললাম, " বাহ!বাহ! সামনের চেয়ে আপনার পশ্চাতদিকটাই তো বেশি সোন্দর। "
আমার কথায় সবাই হোহো করে হেসে উঠল। ডা: ডন বিব্রত। বেচারা ডন কেন যে উল্টা দিকে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে পোজ দিতে গেল, তাও আবার আমার মত ঠোঁটকাটা মানুষের সামনে! মনে পড়লে আজও হাসি পায়!

** আট **
ফুটবল আর ক্রিকেট খেলতে গিয়ে ইনজুরিতে পড়া ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা (নাকি দুর্ঘটনা?)
আজ এর গঁংপষব চঁষষ তো কাল ওর অহশষব ংঢ়ৎধরহ কারো হাতে অনৎধংরড়হ তো কারো আঙুলে ঝঁনষধীঃরড়হ বেচারা দশাসই ইমন তো প্রথমদিন ফুটবল খেলতে গিয়ে পড়ল ওহলঁৎু তে! তারপরই তো তার প্রায় অবসর নিয়ে ফেলা আর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটা!
বেশ কিছুদিন পর ইনজুরি কাটিয়ে মাঠে ফিরল! ঠিক সেদিনই বাধল বিপত্তি। ফুটবল খেলায় বিপরীত দলের একজনের দ্রুত গতির শট লাগল তার তল পেটের নিচে এবং শব্দ হলো থপ করে। যথারীতি তার চিৎপটাং হয়ে পড়ে যাওয়া এবং তারপর তাকে ধরাধরি করে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া ও সেবা শুশ্রুষা করা।
পরে জানলাম ইমনের ব্যথাটা বেশ তীব্র ছিল এবং মিনিট বিশেক স্হায়ী ছিল।

** নয় **
মেয়েদের ইনডোর গেমসের ইভেন্ট গুলি ইন্টারেস্টিং পর্যায়ে চলে গিয়েছিল।
ক্যারাম টুর্ণামেন্ট শুরু হবার পর দেখা গেল ক্যারামের এক বোর্ড শেষ হতেই প্রমিলা এথলেটগণের প্রায় পৌনে দুই ঘন্টা লেগে যেত। স্পোর্টস কমিটি পড়ল ব্যাপক বিপাকে, এই ইভেন্ট কিভাবে সুসম্পন্ন করা যায় সেই চিন্তায়! অনেক আলোচনা-পর্যালোচনা, শলা-পরামর্শ, তথ্য-উপাত্ত বিচার বিশ্লেষণ করে অবশেষে স্পোর্টস কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল, যে ম্যাডাম বা ম্যাডামগন ক্যারামের এক বোর্ড নিতে পারবেন তারাই বিজয়ী। পুরাই লুল ফ্যাক্ট আর কি। রীতিমত গিনেজ বুকে স্থান পাওয়ার মত ব্যাপার!!

** দশ **
আবারও আ: কাদেরভাই প্রসঙ্গ, বেচারার স্বামী ভক্ত বৌ তার জন্য বিভিন্ন পদের শুকনা খাবার যেমন নিজ হাতে ভাজা দেশীয় মুড়ি, বিস্কুট, চানাচুর, ড্রাইকেক ইত্যাদি সুদৃশ্য কনটেইনারে যত্ন করে পাঠিয়ে দিতেন প্রতি সপ্তাহে। রুমমেট হিসাবে আমিও সেগুলির ভাগ পেতাম, কিন্ত সেই খাবারগুলোর উপর নজর পড়ল আমাদের 'হাসিখুশি বিবি' শিখা আপুর। তিনি সদলবলে আমাদের রুমে আসতেন এবং গগনবিদারী অট্টহাসি দিয়ে ডা: কাদেরভাই এর কনটেইনারগুলি স্মার্টলি খালি করতেন।
" আ: কাদেরভাই! খাবারগুলি অনেক মজার! আবার গেলে আবারো আনবেন কিন্তু!" এই বলে আরো একবার অট্টহাসি দিয়ে রুম থেকে বের হয়ে যেতেন শিখা আপু।
আ: কাদের ভাইয়ের কী হত জানি না! তবে আমার ভাগ কমে গেল এ নিয়ে একটু কষ্ট পেতাম আর কি!
আ: কাদেরভাইয়ের স্বামীভক্ত বৌ এই ব্যাপারটা জানলে কি ঘটবে এই ভেবে আমি শংকিত হতাম।

** এগারো **
কালচারাল প্রোগ্রামের দিন ঘনিয়ে আসল, সবার ভিতরে একটা উচ্ছ্বাস, বলা বাহুল্য আমি ছাড়া। কারণ আমি কালচারে পারফর্ম করা যায় এমন কিছু করতে পারি না। এই উচ্ছ্বাস কিছুদিন পর দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হল কারণ ক্লাস, পরীক্ষা, ল্যাব, স্পোর্টস এর চাপে কেউ আর রিহার্সেলে মনোনিবেশ করতে পারে না। ঐ দিকে আমাদের ডিজি মহোদয় তাগাদা দিয়েছেন কালচারাল প্রোগাম যেন সুন্দর হয়; কারণ ইঝগগট-এর মাননীয় ভিসি প্রাণ গোপাল দত্ত স্যার কালচারাল নাইটে উপস্থিত থাকবেন।

আমাদের সহকর্মী ডা: রাজু সব দিক থেকেই ভীষণ সিনসিয়ার (এই ফাঁকে বলে রাখি এই ভদ্রলোককে দেখলে আমার হাসি পায়, কেন পায় জানি না, তার কাছে ক্ষমা চাইছি সেজন্য)।
তিনি কালচারে গাইবেন--"আমি বাংলার গান গাই"। পূর্বোল্লিখিত বিভিন্ন ব্যস্ততায় বেচারা রিহার্সেল করার সময় পান না! তাতে তার বয়েই গেছে! অন্য সময় তো আছেই; ক্লাসে যাওয়া-আসার সময়, বাথরুমে গোসল করার সময় বা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার সময়, রাত্রে ঘুমানোর আগে (বিশ্বস্ত সূত্রে খবর, ঘুমন্ত অবস্হাতেও) ভোরে ঘুম থেকে উঠে তিনি তার রিহার্সেল একনিষ্ঠ

ভাবে চালিয়ে গেছেন। আমার রুমের পাশের রুমেই ডাক্তার রাজুর অবস্হান। সেই সুবাদে তার রেওয়াজের আওয়াজ পেয়েছি প্রায় সময়েই; ক্ষণিকের বিরতিতে।
"আমি বাংলার গান গাই; আমি বাংলায় গান গাই!"

পুস্তক পর্যালোচনা (ইড়ড়শ জবারবী) পর্বে তার উপস্থাপনার সময় পরপর পাঁচ গ্লাস পানি পানের দৃশ্যটিও ভুলতে পারব না! আহারে! প্রতিটি কাজে কতই না একনিষ্ঠতা। ভবিষ্যতে জাতি এবং দেশ অনেক কিছুই পাবে তার কাছে থেকে।

** বারো **
আমাদের তাহমিদ স্যারের কথা না বললেই নয়। এত ভাল অমায়িক এবং আন্তরিক মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। সত্যি বলতে কি তিনি আমাদের সবার প্রতি অন্ত:প্রাণ, সহানুভূতিশীল। কার কি সমস্যা সেটা সমাধানে এগিয়ে আসেন। আবদার থাকলে তা তিনি সহাস্যবদনে মেটাতে চেষ্টা করেন। স্যারের বাসাতে একদিন আমাদের সবার দাওয়াত হলো, সবাই খুব পরিতৃপ্তি সহকারে স্যারের বাসাতে ভুরিভোজ করেছি। ভাবিকে এই সুযোগে ধন্যবাদ দিয়ে রাখি কারণ তার হাতে রান্না করা প্রতিটি আইটেম খুব সুস্বাদু হয়েছিল!

** তেরো **
আমাদের শ্রদ্ধাভাজন ডিজি মো: ফজলুল হক স্যার, কোর্স পরিচালক একেএম বোরহান উদ্দিন স্যার, কোর্স সমন্বয়ক সালাহউদ্দিন স্যারের তত্ত্বাবধায়নে অনুষ্ঠিত ক্লাসগুলি আমরা খুব উপভোগ করেছি।

বিয়ামের শশব্যস্ত দীপু মিয়ার সদাব্যস্ততা আমাদের পুলকিত করত। হাতে মাহেঞ্জোদারো আমলের দুইটা নোটবুক আর সাত সিম সমৃদ্ধ তিন তিনটা মোবাইল সেট নিয়ে কুঢ়যড়ংরং ভঙিতে বিয়ামের করিডর দিয়ে সে যখন হেঁটে যেত তখন মনে হত দুনিয়ার সমস্ত কাজ তার মাথায়, সেই কাজের ভারে সে রীতিমত ন্যুজ।

ক্লাস এটেনডেন্ট ফিরোজ মিয়ার জবপবঢ়ঃড়ৎ এতই ভোঁতা যে একটা কথা একবার বললে সে কখনোই বুঝত না, কমপক্ষে চারবার বলতে হত একটা কাজ করাতে।

বাদশা আর রিয়াজ আমাদের জন্য অনেক ছোটাছুটি করেছে, তাদের কথা বলতেই হয়!

** শেষের কথা **
একটা কথা উল্লেখ করতেই হয় আল্লাহর রহমতে কোন দু:খজনক ঘটনা আমাদের নেই! সবই সুখময়। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী বিশজনের একটা বন্ধন সারাজীবন অটুট থাকবে এক বিশ্বাস আমাদের সকলের!!

ডা. রাজ কামাল আহমেদ: ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

বি.সি.এস

সালমা মোস্তফা নুসরাত

আমরা সবাই জানি, ২৭তম বি.সি.এসের জটিলতা দূর করে, ২৮ তম বি.সি.এসের ঘোষণার জন্য আমাদেরকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এটাই হচ্ছে আমার জীবনের প্রথম বি.সি.এস এবং একমাত্র বি.সি.এস যেটাতে আমি উত্তীর্ণ হয়েছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ছিল; এমনও দিন ছিল শুধুমাত্র দু'জন দু'জনার সাথে গল্প করার জন্য আমরা ভর্সিটিতে যেতাম। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার পর আমি ওর রেজাল্ট জানার জন্য ওকে ফোন করলাম। সে কথা বললো এভাবে,-'এসব কি আমার ভাগ্যে আছে? এগুলোতো ভাই, তোমাদের জন্য'। আমি ধরে নিলাম ও প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় পাস করেনি। কিন্তু, লিখিত পরীক্ষা দিতে গিয়ে ওর সাথে আমার দেখা হয়ে গেলো। পরবর্তীতে সে যা বললো,-'জীবনে একবারই তোমার সাথে মিথ্যা কথা বলছি'।

পরীক্ষার হল থেকে বের হওয়ার পর কোনদিন কোন মেয়ে বলেনা যে, পরীক্ষা ভালো হয়েছে। সবাই বলে, পরীক্ষা ভালো হয়নি। এটাই মেয়েদের রীতি। একদিন লিখিত পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে, আমার এক বান্ধবী জিজ্ঞেস করলো,-'পরীক্ষা কেমন হচ্ছে'? আমি সরাসির বললাম, 'ভালো'। ও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো,-'ভালো'? আমি বললাম,-'হ্যাঁ, ভালো'। ও আবার জিজ্ঞেল করলো, 'সব লিখছো'? আমি বললাম, 'হ্যাঁ'। সবশেষে ও বললো, 'আগে পড়ছিলা না'? আমি বললাম, 'হুঁ'।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর Facebook-এ এই খবর জানিয়ে একটা Post দিলাম। এক বান্ধবী Comment-এ লিখলো-You are a tailess fox. মনে হয় ও প্রিলিমিনারিই পাস করতে পারেনি বলে, এটা বলেছিল। তার পর থেকে ওকে আমি আমার বন্ধুতালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছি।

মৌখিক পরীক্ষার দিন এক পরীক্ষার্থীকে তার বন্ধুরা প্রশ্ন করলো,-'কিরে তোর Preparation কেমন'? সে উত্তর দিলো,-'এইতো কালকে বিকালে জুতা কিনে আনছি'।

অবশেষে, চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হলে দেখা যায় যে, আমি সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে যোগ দিতে মনোনীত হয়েছি।

কিছুদিন আগে, ব্যাংকে গেলে ব্যাংকের এজিএম বললেন,-'আপনি English থেকে পাস করছেন; লম্বা-চওড়া আছেন, Admin-এ কেন যান নাই?

এই ধরনের আজব কথার কোন উত্তর না দিয়ে, আমি চুপ করে ছিলাম।

সালমা মোস্তফা নুসরাত: সহকারী অধ্যাপক, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা; মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর

শুভ (!) নববর্ষ

জেবুন্নেছা জেরী

সকাল বেলায়ই মায়ের চিৎকারে পুষ্পিতার ঘুম ভাঙল। কত বেলা হলো এখনো ঘুম থেকে ওঠার নাম নেই মহারাণির, বলি প্রতিদিন তো অফিসে বেড়ানো হয় ঢ্যাঙ ঢ্যাঙ করে ছুটির দিনে ও কি বুড়ি মাকে রান্নাবান্নায় একটু সাহায্য করা যায় না। আজ বাদে কাল পরের ঘরে গেলে তো সব কাজ একাই করতে হবে। পুরো বয়ান গত দশ বছর ধরে শুনতে শুনতে কান পচে গেছে সেই কাল আর আসেনি। তবে এই শব্দ দূষণে নিদ্রাদেবী পালালেন। মা নাকি বুড়ি! দিব্যি তার পাশে শাড়ি পরে দাড়ালে বড় বোন বলে চালানো যায়, তার মা এমনকি তস্য মা এখনো ধরণীতে বর্তমান। বরং পুষ্পিতাই অফিস আর বাসায় সমান তালে কাজ করতে করতে দিনদিন বুড়িয়ে যাচ্ছে। মনের দুঃখ ভুলতে মোবাইলটা হাতে নিল সে। বন্ধুদের উদ্দেশ্যে নববর্ষ নিয়ে একটা পোস্ট দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে। তৎক্ষণাৎ চোখে পড়লো ওর বান্ধবী বিদিশা সপরিবারে লাল টুকটুকে পোশাক পরিহিত ছবি পোস্ট করে সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছে। পারে ও মেয়েটা! এই সাত সকালেই বর ও পুত্র নিয়ে ম্যাচিং ফটোসেশন। আবার ঢং করে কবিগুরুর কবিতাও জুড়ে দিয়েছে সাথে। ঈর্ষার চিনচিন ব্যথাটা বুকের ভিতর চেপে রেখে একটা ওয়াও ইমোজি দিল। নিজের আর কোন পোস্ট দেয়া হলো না।

নাহ! মাজননী মনে হয় অধিক শোকে কাতর হয়ে খ্যামা দিয়েছেন। আর দেরি করলে সারাদিনে খাবার নাও জুটতে পারে। অগত্যা রান্নাঘরে নিজের বপুখানা হাজির করলো। সবার সকালের খাবার খাওয়া হতে হতেই আবার দুপুরের রান্নার আয়োজন। বৎসরের প্রথম দিন বলে কথা একটু ভালো ভালো (বাবা বলেন ভালো-মন্দ খাওয়া আবার কি? খাবার হবে ভালো ভালো)। আবার ঘরবাড়ি সুসজ্জিত রাখার ও ব্যাপার আছে যদি পথ ভুলে কেউ চলে আসে (পিতাজীর অনন্ত জ্ঞান বিতরণের ধাক্কায় সাধারণত আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুরা এ বাড়ির পথ এড়িয়েই চলে)। কাজকর্মের চাপে বারংবার মনে হচ্ছিল এর থেকে অফিস করাই ভালো। সবজি কাটতে কাটতে মেরুদন্ড বাঁকা হয়ে গেলো। তার মধ্যেই ক্ষণে ক্ষণে মোবাইল ধরলেই বান্ধবীর ছবি।

এবার বিদিশা শাড়ি পড়া আপাদমস্তক লাল-সাদার ছড়াছড়ি সঙ্গে পুত্রটির অঙ্গেও মানানসই পাঞ্জাবী। বুকের চিনচিনটা বেড়েই চলেছে। বিকেলে দেখলো তার বান্ধবী বাবা-মায়ের সাথে ছবি পোস্ট করেছে। নিজের কথা ভাবতেই বিষাদ আচ্ছন্ন করলো। একই ছাদের নিচে বসবাস করেও তাদের পুরো পরিবার এক ফ্রেমে ধরে না কখনো। আর বিদিশা একদিকে নিজের বর-পুত্রকেও পাচ্ছে আবার বাবা-মাকেও। নিজের মনের ব্যথা ভুলতেই বান্ধবীর ছবিতে ভালোবাসার ইমো দিলো পুষ্পিতা। রাতে আবারও দেখলো বান্ধবীর আপডেট এবার বরসহ এবং বর ও পুত্র একই পাঞ্জাবী পরিহিত। এই ছবি তুলতে না পারার দুঃখে প্রাণের মায়াই চলে গেল। এবার আর প্রাণে ধরে কোন ইমোজিও দিতে পারলো না। সারাদিন আমি কাজ করতে করতে মরলাম আর উনি শাড়ি পরে পরী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এইবার মনে হচ্ছে লাড্ডুটা খাওয়াই (মানে বিয়েটা করাই) ভালো ছিল। অবশেষে বান্ধবীকে ফোনটা করেই ফেলে পুষ্পিতা। কিরে! তোর একারই তো শুভ নববর্ষ মনে হচ্ছে! সারাদিন ঘোরাঘোরি! ভালোই আছিস। উত্তরে সংক্ষিপ্ত হুম শুনে মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো। কেটেই দিলো ফোনটা। পরক্ষণেই দেখলো বান্ধবীর খুদেবার্তা। ফেসবুক এ তো ট্রেইলার দেখেছিস সিনেমার বাকি গল্পটা কখনো সাক্ষাতে বলবো।

কথায় বলে রাজায় রাজায় দেখা হয়, নদীতে নদীতে দেখা হয় অথচ বোনে বোনে দেখা হয় না। তাদের হলো এই দশা। এক শনিবার অফিস পালিয়ে দুই বান্ধবী দেখা করলো এক দ্রুত খাবারের (ফাস্ট ফুড মানে তো তাই!) দোকানে। প্রথমেই বিদিশা জানতে চাইল পুষ্পিতা, তুই কি করেছিস সারাদিন? উত্তরে সে বললো সারাদিন তো মাকে রান্না আর ঘর গোছাতে সহায়তা করতেই কেটে গেল তাও মা বলে আমি নাকি কিছুই করি না শুধু পড়ে পড়ে ঘুমাই। আর তুই কি সুন্দর বর ছেলে নিয়ে সারাদিন ঘুরলি। তাহলে শোন, সকালের ছবি তোলার জন্য আগের দিন রাতেই বর ও ছেলেকে লাল জামা পড়িয়ে ঘুম পাড়িয়েছিলাম। যাতে ওনাদের নিদ্রাভঙ্গ হওয়া মাত্রই ছবি তুলতে পারি। সকাল বেলা জামাকাপড় পাল্টাতে বললে দুজনেই আমার ওপর এক হাত নিত না। আর নিজে ঘরের ছেড়া জামার ওপরে শুধু একটা লাল ওড়না পড়েছি। সেলফি তুলেছি দেখিস না পুরোটা তুলিনি। বর লুঙ্গি পড়া ছবি পোস্ট করলে আস্ত রাখবে!

ছবিটা পোস্ট করেই ছুটে গেছি রান্নাঘরে গরম ভাতকে পানি দিয়ে পান্তাভাত বানিয়ে, চারমাস আগের কেনা ইলিশ মাছ ভাজি করে (দুঃখিত! মাছটা আমি ভাজিনি বর ভেজেছে। আমি ভাজলে আবার মাছেরা তাওয়া ত্যাগ করতে চায়না।), কাচালংকা, পেঁয়াজ কেটে একটা প্লেট সাজিয়ে কোনরকম একটা ছবি। এরপর বর চলে গেলো মেহমানদের আনতে ছেলেকে বিদ্যালয়ে পৌঁছে দিয়ে আমি নামলাম যুদ্ধে। আরে অত ভ্রুভঙ্গি করিস না বয়স বেড়ে যাবে। সময়ের সাথে যুদ্ধ বলিস আর দৌড় বলিস সেটাই শুরু করলাম। মেহমান আসার আগে ঘর পরিস্কার থেকে রান্না সবই তো একাই করতে হবে। মহারাণির তো কোন দেখা নেই। দাড়া দাড়া বুঝলাম না। পুষ্পিতা থামিয়ে দিল বিদিশাকে। আমার মাতৃদেবী তো আমাকে মহারাণি বলে তুই আবার কাকে মহারাণি বলিস! আরে এখন তো কাজের লোক বলা যায় না। তাতে তো নিজে অকাজের হয়ে যেতে হয়। তাই মহারাণির জয় হোক।

প্রথমেই সংক্ষিপ্ততম পদ্ধতিতে (ওই যে, ছোটবেলায় সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় করেছিস না, সেরকম) বা শুষ্ক পদ্ধতিতে ঘর পরিচ্ছন্নতাকরণ মানে ঝাড়ু দিলাম আর জামাকাপড় গোছালাম। তারপর শুরু করলাম রান্না। মহারাণি সকালে আসবে ভেবে আগের দিন কিছুই করে রাখিনি। চোখের জল, নাকের জলে রাগ ধুয়ে সবজি, কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ কাটতে কাটতে দেখি মসলা নেই। ব্লেন্ডারের পাত্র খুঁজে পেলেও ব্লেড বাবাজির দেখা না পাওয়ায় প্রাচীন পদ্ধতি (শিল-নোড়া) অবলম্বন করতে হলো। রান্না শেষে তড়িৎগতিতে জলকেলি (গোসল) করে লাল-সাদা শাড়িটা পড়লাম। ভাগ্যিস ছেলের বিদ্যালয়ে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান ছিল। ছেলে বাসায় থাকলে আর শান্তিতে কাজ করা লাগতো না। দৌড়ে ছেলের বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে যেয়ে মাতা-পুত্রের ফটোসেশন। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের সাথেও। ভাবমূর্তির ব্যাপার আছে তো। সেখানে সবাই জানে আমি যে কোন অনুষ্ঠানে শাড়ি পড়েই যাই।

এইবার খবর পেলাম মেহমান আসতে যানজটের কারণে অনেক দেরি হবে। তাই শাড়ির মায়া বিসর্জন দিয়ে ছিন্ন জামাকাপড় পড়ে সংক্ষিপ্ত বাদ দিয়ে বিস্তারিত পদ্ধতিতে বা আদ্র পদ্ধতিতে (বুঝেছি আর বলতে হবে না ঘর মুছলি)। তখনো মহারাণির পাত্তা নেই। অথচ আগের দিন জাল ভোট প্রদানকারিদের নিজের নাম ও বাবার নাম শেখানোর মত করে বলে দিয়েছিলাম দিনে তাড়াতাড়ি আসতে (ওই যে, যখন ভোটার আইডিকার্ডে ছবি থাকতো না তখন একজনের ভোট আরেকজন দিতে যেত)। ঘর মোছার পর চোখ গেলো ওপরের দিকে। জানিস তো আমি মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করে রাখি। মানে জেগে ঘুমানোর মত। কারণ অক্ষিগোচর হলেই কর্মপরিধি বেড়ে যায়। অত ভণিতা না করে কি দেখলি তাই বল শুনি। অস্থির হয়ে ওঠে পুষ্পিতা। আরে ঘরের মেঝে পরিস্কার করার পর দেখলাম বৈদ্যুতিক পাখাগুলো পাতিলের তলাকে লজ্জা দিচ্ছে আর ঘরের ছাদ পোড়োবাড়ির মত মাকড়সার অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। বিদিশার কথা শুনতে শুনতে পুষ্পিতার জুতাবিহীন লোকের সাথে পাবিহীন লোকের সাক্ষাতের গল্প মনে পড়ে যাচ্ছিলো। সান্তনা দিতেই জিজ্ঞেস করলো কি করলি তারপর। পাঁচখানা বৈদ্যুতিক পাখা আদ্র পদ্ধতিতে আর ছাদ শুষ্ক পদ্ধতিতে, সম্পূর্ণ ঘর শুষ্ক ও আদ্র উভয় পদ্ধতিতে পরিচ্ছন্ন করে মেরুদন্ডের হাড় কয়টি ও কিকি সেটা মনে করলাম। তারপর হুড়োহুড়ি করে পুনরায় গোসল সেরে নিলাম।

তাহলে আংকেল আন্টির সাথে ছবি তুললি কখন? সেখানেও তো শাড়ি পড়া, আবার আন্টির পরনেও একই শাড়ি। আরে শাড়ির

আচল কুচি সেফটিপিনে আটকে রেখেছিলাম যাতে দ্রুত পরিধান করা যায়। কাজ শেষ করে দশম বর্ষে পদার্পণকারী পুত্রকে পাখিমাতার মত (মানে পাখি মা যেভাবে পাখি বাচ্চাকে ঠোঁটে তুলে খাওয়ায়) খাবার খাইয়ে পুনর্বার শাড়ি পরে বের হলাম বাবা-মায়ের সান্নিধ্য লাভের আশায়। একই শহরে থেকেও যদি বছরের প্রথম দিন বাবা-মাকে না দেখি তাহলে তো সমাজে অচ্ছূৎ হতে হবে। তাছাড়া আমার লাল-সাদা শাড়ির আরেকটা কপি তো মা পরবেন। পহেলা বৈশাখ ছাড়া কি আর মা-মেয়ের ম্যাচিং শাড়ি পরা ফটোসেশন সম্ভব! জানিস তো, যে পুরুষ সুন্দরী রমণীর ডাক উপেক্ষা করে চলে যেতে পারে তাকে রিকশাওয়ালা বলে। সেখানে আমি তো কৃষ্ণকলি। কণ্ঠনালিকার বারোটা বাজিয়ে শখানেক রিকশাওয়ালাকে বলার পর একজনের দয়া হলো তাও দ্বিগুণ ভাড়ায়। (এই জন্য বরকে প্রায়ই বলি একটা রিকশা কিনে দিতে। তা বরেরা আর কবে বউদের কথা শুনেছে!) রিকশায় বসেই মাকে ফোন করলাম, আমি আসছি লাল-সাদা শাড়িটা পরে তৈরি হয়ে থাকো।

বাবা-মাকে দেখে বাসায় ফেরার পর মনে পড়লো মেহমানদের জন্য দুপুরের খাবার হিসেবে যা তৈরি হয়েছে তা রাতের খাবার হিসেবে অচল। সুতরাং পুনরায় শাড়ি বর্জন করে ছেড়া জামা পরে রান্নাঘরে। এর মাঝে আবার দেখি পরিস্কারকরণ কক্ষ (ওয়াশ রুম) গুলোই অপরিস্কার। সুতরাং সেগুলো পরিস্কার করে আবার ও গোসল। অতিথিসহ বর নিকটবর্তী শুনে পুনরায় শাড়ি পরিধান। এর মধ্যে ছেলেকে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও উৎকোচ প্রদান (পাঞ্জাবি পরে থাকার জন্য)। অতঃপর, রোগী মারা যাওয়ার পর ডাক্তার আসার মত মহারাণির আগমন (মনে হচ্ছিল মহারাণি বাসায় সিসিটিভি বসিয়েছে। আর যখন দেখেছে সব কাজ শেষ তখন এসেছে) এবং পতিদেবের মেহমানসহ গৃহপ্রবেশ দেখে আমি বাকরুদ্ধ। অতিথির সামনে মহারাণিকে বকাঝকা করতে না পারার দুঃখ ভুলতে বরকে পাঞ্জাবি পড়িয়ে সপরিবারে ফটোসেশন। দিনে কয়বার গোসল করলাম সেটাই মনে করতে পারছি না, খাওয়ার কথা তো দুরস্থ।

পুরো সিনেমা দেখে পুষ্পিতা তিনটি সিদ্ধান্তে উপনীত হলো। প্রথমতঃ মা মহারাণি বলে ডাকলে ও গৃহকর্মে সহায়তার বিনিময়ে পারিশ্রমিক চাইবে। দ্বিতীয়তঃ এখন থেকে প্রতিদিন এই প্রার্থনা করবে আরও দশ বছর যেন মা একই ডায়লগ দিতে পারে এবং সে শুনতে পারে; এই সৌভাগ্য যেন তার হয়। তৃতীয়তঃ নরকের ট্রেইলার এর গল্পের মত (ওই যে, এক লোক নরকে যেয়ে সব বিখ্যাত অভিনয়শিল্পী, খেলোয়াড়, রাজনীতিবিদ আর বেহেশতে যেয়ে কতিপয় বয়স্ক লোককে দেখে নরকে যেতে চাইল) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পোস্ট দেখে কাউকে ঈর্ষা করবে না।

লেখক: বিসিএস রেলওয়ে প্রকৌশল (যান্ত্রিক), কর্মব্যবস্থাপক/প্রকল্প (চঃ দাঃ), ৭০ টি এমজি ডিই লোকোমোটিভ সংগ্রহ প্রকল্প, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।

স্বপ্নযাত্রার শুরুটা

মাসরুর-উর-রহমান

স্বপ্নযাত্রার শুরুটা ছিল স্বপ্নবৎ।

১ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখ পূর্বাহ্নে যোগদান করতে হবে ঝালকাঠি সদর উপজেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়ে গিয়ে। বেসরকারি চাকরি আর অবৈতনিক প্রশিক্ষণ থেকে ইস্তফা দিয়ে সে উদ্দেশ্যে বরিশালে হাজির হয়েছি ৩০ নভেম্বর সকালে। এরপর সারাদিন কেটেছে দু'জনের নানান সনদপত্র, আদেশ আর প্রজ্ঞাপন ছয়-সাত কপি করে ফটোকপি করে সে তাড়া তাড়া কাগজপত্র পরিচিত-জন দিয়ে সত্যায়িত করিয়ে থরে থরে গুছিয়ে রাখতে। প্রজাতন্ত্রের দয়িত্বশীল কর্তকর্তা হিসেবে যোগদান করবো; কাগজের ভার একটু বেশি তো হবেই।

বিকেলে গেলাম দু'জনের জন্য সিল বানাতে। সাদা কাগজে সরকারি নাম-পরিচয় লেখা সে সিল মেরে সেদিকে তাকাতেই মনের গোপন কুঠুরিতে মৃদু এক উচ্ছ্বাসের বুদবুদ টের পাই। এখন থেকে এর-তার নথিপত্রে টপাটপ স্বাক্ষর দিয়ে ঝপাঝপ সিল মেরে সত্যায়িত করে দিতে পারবো।

১ ডিসেম্বর সকালে দু'জনে সেজেগুজে অফিসার-সুলভ পোশাকে গাড়িতে চড়ে বরিশাল থেকে রওনা দিলাম। পথের দু'ধারে শীতের বরিশাল। ছোট ছোট বাড়িঘর আর অবারিত প্রান্তর। মাঝে মাঝেই পুকুর কিংবা খাল। মাত্র বিশ মিনিটেই ১৬ কিলোমিটার দূরের ঝালকাঠিতে পৌঁছে গেলাম। লোকজনকে জিজ্ঞেস করে পথনির্দেশ নিয়ে হাজির হলাম উপজেলা পরিষদ এলাকায়।

উপজেলা পরিষদ এলাকার নানান সরকারি দপ্তরের মাঝে একেবারে সামনেই স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়। বড় একটা মাঠের পরে লম্বা এক দোতলা দালান। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে বসলাম উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ নওশের আলী স্যারের রুমে। বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারে নিয়োগ পাওয়া ২৮তম বিসিএস এর ছয়জন কর্মকর্তা যোগদানের আবেদন দাখিল করলাম। এদের মধ্যে আমার স্ত্রী ডাঃ রাহাতুন নাঈম ম্যাগলিন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃপঃ কর্মকর্তার কার্যালয়ের মেডিকেল অফিসার, তাই তার অফিস এখানেই; আর আমি নবগ্রাম ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সহকারী সার্জন।

যোগদানের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে বের হয়েই সিদ্ধান্ত নিলাম, এখনই আমার মূল কর্মস্থল নবগ্রামে যাবো। অফিসের সবাই নিরস্ত করার চেষ্টা করলেও জিদ ধরে রওনা দিলাম। শীর্ণকায় বাসন্ডা নদীর পাশ ঘেঁষে সরু পাকা রাস্তা ধরে নবগ্রাম ইউনিয়নে আমার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যখন পৌঁছলাম, ঘড়িতে তখন প্রায় তিনটা। নীরব নিঝুম চারিদিক। স্বাস্থ্যকেন্দ্র তো বন্ধই, বাইরের গেটেও

মোটা তালা ঝুলছে। বিশাল সে লোহার গেটের ফাঁক দিয়ে নজর বুলিয়ে দেখলাম, সাদা-হলুদ রঙের বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একতলা দালানের কপালে লেখা 'স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, নবগ্রাম ইউঃ, উপজেলা ঝালকাঠী'। সরকারি চাকরিজীবনে আমার প্রথম কর্মস্থল।

পরদিন বেশ সকাল সকালই পৌঁছে গেলাম নবগ্রামে। পরিচয় হলো স্যাকমো বিদ্যুৎ, আয়া রাশেদা, আর গার্ড বাদশার সাথে। গ্রামের সরকারি দপ্তর বলতে যে হতশ্রী চেহারা মনে ভাসে, এটার অবস্থা তেমন খারাপ না। দালানটা বেশি পুরনো না, রুমগুলোও মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। কাঠের শক্তপোক্ত টেবিল আছে, কালো রেক্সিনে ঢাকা ফোম বসানো আরামদায়ক চেয়ার আছে, সেই চেয়ারের উপরে লম্বা তোয়ালে আছে, দেয়াল ঘেঁষে নড়বড়ে আলমারি আছে। বিপি মেশিন আর স্টেথোস্কোপ আছে, আবার চা-নাস্তা খাওয়ার জন্য কাপ-পিরিচও আছে।

সকালে উঠে বরিশালের হাতেম আলী কলেজ চৌমাথা থেকে রওনা দিতে হয় অন্য জেলায় আমার অফিসের দিকে। ১৮ কিলোমিটার পেরনোর জন্য যান মাত্র একটাই-মাহেন্দ্র আলফা নামের থ্রি-হুইলার। সেটার পিছনে গাদাগাদি করে বসাটা আমার পৃথুল শরীরের জন্য আরামদায়ক না হওয়ায় আমি বসি ড্রাইভারের ঠিক বামপাশে। একহাতে আমার বাহনের ভিতরে ঝুলানো পলকা হাতল ধরে ভারসাম্য রক্ষা করে তাকিয়ে থাকি সামনের এবড়োখেবড়ো রাস্তার দিকে কিংবা হাতের বামের রোগা খালটার দিকে। বড় বড় গাছগুলো ছুটে ছুটে যায় পিছন দিকে। মাথাটা একটু বাইরে বের করলেই চোখ বন্ধ হয়ে যায় বাতাসের তোড়ে। চুলগুলো উড়তে থাকে পতপত করে। মুখটা হয়ে পড়ে হিম হিম অসাড়।

সোনামিয়ার পুল, ধর্মদী বাজার, কড়াপুর, সুগন্ধিয়া, বিনয়কাঠি পেরিয়ে নবগ্রাম পৌঁছে আলফা থেকে নামি। স্কুলের পাশ দিয়ে পুরো নবগ্রাম বাজার এফোঁড়-ওফোঁড় করে বাজারের শেষপ্রান্তে পৌঁছে আরেকটা সরু গলি বেয়ে যেতে হয় আমার অফিসে। বাদশা খুব আগ্রহ করেই বাজার থেকে গরম গরম সিঙ্গারা নিয়ে আসে। পিঁয়াজ আর মরিচ সহ সিঙ্গারায় কামড় বসিয়ে হাঁ করে ঊর্ধ্বপানে চেয়ে থেকে গরমটা সামলে সে সিঙ্গারা গিলতে হয়। চা খেতে খেতে গল্প জমে বাকিদের সাথে।

রোগী আসে নিয়মিতই। চিকিৎসাপ্রত্যাশী রোগী আসেন, তবে সে সংখ্যা নেহায়েতই কম। বেশির ভাগই ওষুধপ্রত্যাশী রোগী। রোগলক্ষণ বলতে তেমন আগ্রহী না হলেও প্রয়োজনীয় ওষুধের নাম বলতে দ্বিধা নেই। সব ওষুধ বুঝে পেলে চেহারায় সন্তুষ্টি ফোটে; তবে সাদা কাগজের প্রেসক্রিপশনটা পকেটে ভরেন নেহায়েতই ভদ্রতাবশত, নিতান্তই অনিচ্ছা-অবহেলায়। মাসের শেষে একদিন সব ওষুধের স্টক শেষ শুনে এক রোগী বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, 'তাইলে কিরমির (কৃমির) বড়ি দেন, চুইতে চুইতে বাড়ি যাই'।

মাঝে মাঝে নিজ কর্মস্থলের সীমানার ভিতরেই হেঁটে বেড়াই। নজর ফেলি কাটা গাছের মোটা গুঁড়িটার দিকে, দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো লম্বা লম্বা গাছগুলোর দিকে, আর চারদিকে ছড়িয়ে থাকা শীতের ঝরাপাতার দিকে। পিছনে দেখি পরিবার কল্যাণ পরিদর্শকের অব্যবহৃত কোয়ার্টার, আর সীমানাপ্রাচীর ঘেঁষে পতিত জমি। সীমানা পেরিয়ে ফেরার পথে মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়াই বাজারের আগেই সুগন্ধা নদীর পাড়ের ঘাটে। দেখি শান্ত নদীর স্থির স্নিগ্ধ রূপ, আর তার বুকে দুলতে থাকা ছোট ছোট নৌকা। কান পাতলে শোনা যায় অজানা পাখিদের ডাকাডাকি হুটোপুটিও। আমি হাঁটাপথে বাজারের কাঁচা সবজি, শস্তা সব খেলনা-মার্বেল আর পোশাক-পরিচ্ছদ দেখতে দেখতে রওনা দিই স্বগৃহ-পানে।

চিকিৎসক সংকটের কারণে আমার স্ত্রীকে সপ্তাহে তিনদিন ঝালকাঠি সদর হাসপাতালের বহির্বিভাগে রোগী দেখতে হয়। সংকট

বেড়ে গেলে জরুরী তলব পেয়ে আমাকেও চলে যেতে হয় সেখানে। ওখানকার রোগী দেখার তরিকা আবার সম্পূর্ণ আলাদা। এক বেলায় রোগী দেখতে হয় প্রায় দেড়শো। তাই রোগের ইতিহাস শোনা, গায়ে হাত দিয়ে পরীক্ষা করা, প্রেসক্রিপশন লেখা, ওষুধের স্লিপ লেখা, সব চলতে থাকে যন্ত্রবৎ।

সংকট আরো বাড়লে সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগে ইভিনিং-নাইট ডিউটিও করতে হয়। তখন রোগে ভোগা অসহায় মানুষ যেমন আসেন, তেমনি গ্রামের সহজসরল ভোলাভালা মানুষ হিসেবে পরিচিত দু'পক্ষ নিতান্তই সামান্য ছুতোয় মারামারি করে মামলা চালানোর জন্য ইনজুরি সার্টিফিকেটের সন্ধানে হট্টগোলে লোকজন নিয়ে এসে ভিড় জমান জরুরী বিভাগে।

জাতীয় টিকাদান দিবসে রিকশা নিয়ে পথে পথে ঘুরি। একসময় পথ ছেড়ে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে বিরান প্রান্তর, হাট-বাজার, মেঠোপথ আর উঠান পার হয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে দেখি বাড়িতে বাড়িতে টিকাদান। বাড়ির লোকেরা কোথাও মিষ্টি খেতে দেন, কোথাওবা মুড়ি আর পানি। কখনো নিজেরাই ক্লান্ত হয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে পানিতাল খাই বা টি-স্টলে বসে চুমুক দিই চায়ের কাপে। বিকেলে ঘাম জবজবে হয়ে বাসায় ফিরে ফেসবুকে দেখি, আমার কর্পোরেট বন্ধু অফিসের কাজে লন্ডন গিয়ে টেমস নদীর টাওয়ার ব্রিজের পাশে ছবি তুলেছে। আমিও তাকে দেখাই অফিসের কাজে অজপাড়াগাঁয়ে গিয়ে নাম-না-জানা খালের ভাঙা সেতুর পাশে তোলা আমাদের ছবি।

একদিন নবগ্রাম থেকে ঝালকাঠি যাচ্ছিলাম। এই পথের টেম্পুগুলোর দু'পাশ দিয়ে যেমন মাঠ-ঘাট-বাড়িঘর দেখা যায়, তেমনি ভাঙা-ফাটা পাটাতনের ফাঁক দিয়ে দ্রুত অপসৃয়মান নিচের রাস্তাও দেখা যায়। বাইরে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ দিগন্তবিস্তৃত সবুজের মাঝে উজ্জ্বল হলুদ ঝলকানিতে চোখ ঝলসে গেলো। আরে! এই সূর্যমুখীর বাগান এখানে এলো কোথা থেকে! নামা হলো না, কিন্তু তৃষিত নয়নে চেয়ে রইলাম অনেকক্ষণ ধরে। স্ত্রীর সাথে আলাপ হলো। দু'দিন পরেই ঝালকাঠি থেকে গাড়ি নিয়ে তিনি পৌঁছলেন সূর্যমুখী বাগানে, আর আমি এদিকে নবগ্রাম থেকে। আইল ধরে হেঁটে বাগানের পূর্বদিকে পৌঁছে আদিগন্ত বড় বড় সূর্যমুখীর সাথে ছবি তুললাম। মাথার উপরে সূর্য তখন অকৃপণ, কিন্তু সূর্যমুখীর ঝলমলে সৌন্দর্যে আমাদের মনে তখন হু হু খুশির সুবাতাস।

একসময় সরকারি চাকরিজীবনের ছয়মাস পূর্ণ হলো। ১ জুন ২০১১ তারিখে দুজনে চলে গেলাম ঝালকাঠির ডালিয়ান চাইনিজ রেস্টুরেন্টে। প্রায়-গোলাপী স্যুপে মিষ্টির পরিমাণ একটু বেশি ছিল, তবে মনের মধ্যে উদযাপনের ফুর্তিটা ছিল তার চেয়েও বেশি।

শীত-গ্রীষ্ম পার হয়ে বর্ষা এলো। বরিশাল থেকে নবগ্রামে তখন টাটা ম্যাজিক নামের একরকম হিউম্যান হলার যায়। তুলনামূলক আরামদায়ক আসনে বসে মোটামুটি মসৃণভাবেই যাওয়া যায়। পথের পাশের শীর্ণ সে খাল এখন যৌবনে ঢলঢল। দুকূল ছাপানো শরীরে তখন পানির প্রবল স্রোত। গাছপালাগুলোও অনেক বেশি সবুজ। একদিন গাড়ি থেকে নেমে আমার হাসপাতালে যাওয়ার পথে শুরু হয় মুষলধারে বারিপাত। বন্ধ টিনের ঘরের চালার নিচে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম চালের উপরের বর্ষাসঙ্গীত। চোখের আধহাত সামনে তখন ঢেউটিন বেয়ে নামা জলের সার সার সমান্তরাল ধারা।

মাঝে মাঝে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে ঢাকায় যেতে হয়। ঝালকাঠি সদর উপজেলার ডাক্তারদের অনেকেরই তখন ভালো পসার, আর চেম্বারে বেশ ব্যস্ততা। আবার অনেকের ঢাকা শহরে আবাসস্থলের অভাব। আমাদের মতো ভবঘুরে মানুষের সেরকম সমস্যা নেই। তাই প্রশিক্ষণের ডাক এলেই উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃপঃ কর্মকর্তা স্যার আমাকে বা আমার স্ত্রীকে দায়িত্ব দেন; কখনোবা দু'জনকেই। আমরা তখন বাবা বা শ্বশুরকে ফোন করে লঞ্চের টিকিট কাটতে বলি, আর বাসায় ফোন করে বলি মেয়েকে রেডি

করে ব্যাগ গুছিয়ে ফেলতে। স্যারের চিঠি হাতে নিয়ে তড়িঘড়ি উঠে পড়ি লঞ্চে; গ্রামের চাকুরে ক'দিনের জন্য দেখে আসি ঢাকা শহরের লাল লাল নীল নীল বাতি।

২০১১ এর অক্টোবর বা নভেম্বরের কোন একদিন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে গিয়ে বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণে অংশ নেয়ার জন্য আবেদনপত্র দিয়ে আসি। তখনো ২৮তম বিসিএস (স্বাস্থ্য) প্রায় শুরুই হয়নি। আমাদেরও দেরিতে আপত্তি নেই। এ অবস্থায় ৪ ডিসেম্বর দুপুরে নবগ্রাম থেকে বরিশালে ফেরার অল্পক্ষণ পরেই স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে ফোন পাই, আমরা বুনিয়াদী প্রশিক্ষণে অংশ নিতে চাই কিনা। নীলক্ষেতের জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমিতে সেদিন থেকে শুরু হওয়া প্রশিক্ষণে দুজন যোগদান করেননি। আমরা সেস্থানে যোগ দিতে চাইলে ঠিক এক্ষণি জানাতে হবে। আমার স্ত্রী তখন সদর হাসপাতালে অজস্র রোগী দেখে মাত্র রওনা দিয়েছেন। ফোনে শুনে রাজি হয়ে গেলেন। আমিও জানিয়ে দিলাম ঢাকায়, আর সাথে সাথে রওনা দিলাম ঝালকাঠির পথে। ঢাকা থেকে আমাদের অর্ডার ফ্যাক্স করে পাঠানোর পরে জানলাম, আমাদের অফিসের ফ্যাক্স মেশিন নষ্ট। ঝালকাঠি পৌঁছে এক দোকানের ফ্যাক্স নম্বর পাঠানোর পরে সে অর্ডার পেয়ে শেষবিকেলে ছাড়পত্র ছাপিয়ে স্যারের স্বাক্ষর নিয়ে আবার বরিশালের পথে। ত্বরিৎ সিদ্ধান্তে ততক্ষণে লঞ্চের টিকিটও প্রস্তুত। প্রশিক্ষণ-উপযোগী কিছু স্যুট-টাই সঙ্গে নিয়ে দৌড়ে দৌড়ে সপরিবারে লঞ্চে উঠে ভেসে পড়লাম কীর্তনখোলার বুকে-সামনে দু'মাসের জন্য ঢাকা শহর।

ক্লাস-পরীক্ষা, শরীরচর্চা-খেলাধুলা, পাঁচবেলা স্বাস্থ্যকর আহার, উপস্থাপনা আর শখের নাচ, ম্যাগাজিন-স্যুভেনিরে লেখালেখি, বান্দরবান-কক্সবাজার ভ্রমণ, আর কারণে-অকারণে ফটোসেশন নিয়ে স্বপ্নের মতোই ফাস্ট ফরোয়ার্ড কেটে গেলো সে দুইমাস। কর্মস্থলে ফেরার পরপরই আবার ঝালকাঠি জেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী গেলাম কুয়াকাটায় অবকাশ যাপনে। র‍্যাফল ড্রতে লটারির মাধ্যমে চল্লিশ জন পুরস্কার পেলেও পোড়াকপালে আমি আর আমার স্ত্রী কিছু পাইনি দেখে শেষ পর্যন্ত সিভিল সার্জন স্যারের নির্দেশে আমাদের হাতে তুলে দেয়া হয় সান্ত্বনা পুরস্কার।

কাজের সুনির্দিষ্ট কোন স্থান-কাল-পাত্র ছিল না। বাউকাঠি স্কুলে পাবলিক পরীক্ষায় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নার্ভাস বাচ্চাদের দেখভাল করতে হয়েছে, হজ্জযাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে সনদপত্র দিতে হয়েছে, প্রতিদিন সকাল থেকে দুপুর ক্লাস নিয়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের শেখাতে হয়েছে রোগব্যাধির অ-আ-ক-খ, জেলা স্টেডিয়ামে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা চলাকালীন হঠাৎ বৃষ্টিতে ছোট্ট ত্রিপলের নিচে গাদাগাদি দাঁড়িয়ে বর্ষার ছাঁট পেতে হয়েছে; আবার তেমনি সরকারি মটরসাইকেলের পিছনে চেপে দুর্গম বন্ধুর পথ পেরিয়ে শাখাগাছি কমিউনিটি ক্লিনিক উদ্বোধন করতে গিয়ে সমীহ আর সম্মানও জুটেছে প্রচুর।

কালে কালে দিন যায়, বছর ঘোরে। একদিন প্রান্তিক জনগণকে চিকিৎসাসেবা দেয়ার আবশ্যিক পাট চুকে যায়। আমি বদলি হই ঢাকার জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতালের প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগে, আর কিছুদিন পরেই স্ত্রী বদলি হন বরিশালের শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগে।

শেষবারের মতো যাই স্মৃতিবিজড়িত নবগ্রামে। বসি আমার সে কালো চেয়ারে। চা-সিঙ্গারা নিয়ে আড্ডাটাও আগের মতো জমে না। মনে ভিড় করে হাজারো স্মৃতি। কর্মস্থলকে পিছনে রেখে স্যাকমো অনিমেষ, ফার্মাসিস্ট হাসান, গার্ড বাদশা আর আয়া রাশেদার সাথে ছবি তুলে স্মৃতির সংখ্যা বাড়াই। মনে পড়ে, ক'দিন আগে ঈদ বখশিশ দেয়ার পরে রাশেদা সেই টাকা দিয়ে জিলাপি কিনে আশেপাশের সব বাড়িতে ইফতারের সময় বিলিয়েছিল, আর বাদশা সে টাকা দিয়ে শার্ট কিনে ঈদের পরে এসে পান-খাওয়া দাঁত বের করে হাসিমুখে দাঁড়িয়েছিল। আজও তার মুখে চেনা সেই হাসি। তবে তার চোখের দু'কোণে কি দু'ফোঁটা অশ্রুর ঝিকিমিকি?

আমার স্ত্রী ছাড়পত্র নেয়ার পরদিন তার বিদায় সংবর্ধনা আয়োজিত হয় ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে। আমিও সেখানে আমন্ত্রিত। এই স্বাভাবিক সৌজন্যের প্রথা উঠে যাওয়া চিকিৎসক-সমাজে এমন অপ্রত্যাশিত আন্তরিক আয়োজনে আমরা মুগ্ধ। শ্রদ্ধেয় সিভিল সার্জন স্যার, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা স্যার সহ সবার দরদী বক্তব্যে আমাদের গলার ভিতরেও টের পাই কীসের যেন একদলা ভার, আর চোখের ভিতর থেকে উঠে আসে কীসের যেন টলোমলো কাঁপুনি।

দু'জনে বসলাম ঝালকাঠি শহরের প্রান্তে পৌর পার্কে। সামনে প্রমত্তা বিষখালী নদী। বাইরের হু হু বাতাসটা বয়ে যায় বুকের ভিতরেও। নির্নিমেষ অনির্দিষ্ট দৃষ্টির সমুখে একদিকে যেমন ব্যস্ততর হাসপাতালে আরো দায়িত্বশীল পদে কাজ করার তাড়না, অন্যদিকে তেমনি শান্ত নিরিবিলি নিরূপদ্রব প্রথম কর্মস্থলকে চিরতরে বিদায় জানানোর বেদনা।

এই পরিবর্তন, কঠিনতর নব-দায়িত্ব গ্রহনের উদ্বেগ-উত্তেজনা, আর ফেলে আসা দিন ঘিরে গোপন দীর্ঘশ্বাস, এই নিয়েই ধীর-নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলে জীবন।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক (চলতি দায়িত্ব), প্লাস্টিক সার্জারি, বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা

অনুগল্প

মোহাম্মদ হেফজুর রহমান

খাটাশ

শহরের লোক এর আগে কখনো খাটাশ দেখেনি; তারা কেবল বইতেই পড়েছিল খাটাশের কথা; পড়েছিল খাটাশ নাকি নোংরা, ইতর প্রানী। শহরের লোক কল্পনায় ভেবে ভেবে আকুল হয়; আর সময় চলে তার নিজস্ব নিয়মে। এরপর শহরে এলো সেই মানবিক লোকটি, খাটাশ সাথে নিয়ে। শহরের প্রতিটি প্রান্তে, প্রতিটি মানুষ দেখবে বলে খাটাশটিকে তিনি শহরের প্রতিটি কোণে নিয়ে গেলেন। শহরময় মানুষ এলো খাটাশ দেখতে। মানুষ দেখলো; মানুষের দেখার, জানার তৃষ্ণা মিটলো। মানুষ আবিষ্কার করলো খাটাশের মাঝে অনেক প্রাণীর বৈশিষ্ট্য আছে। খাটাশকে দিনরাতের ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন রঙে, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে, আর আকৃতিতে দেখা যায়। খাটাশের আছে সাপের মত সম্মোহনী ক্ষমতা, সে ক্ষমতা দিয়ে সে মানুষ আটকে ফেলে। মানুষ টের পায় ওর গা থেকে ভোঁদড়ের মত গন্ধ আসে। তবু মানুষ খাটাশটাকে ভালোবেসে নিজেদের মাঝে জায়গা করে দিল। আর, সময় চলল তার নিজস্ব পথে। শহরে মাত্র একটা খাটাশ; কেমন করে হবে! মানুষ ব্যাকুল হয়। ব্যাকুল হওয়াও মানুষের ধর্ম। খাটাশ বাঁচাতে মানুষ তার নিজস্ব অভিযোজন ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটায়।

ফসল

কৃষকদের পরিশ্রমের ফসল কে খেয়েছে, সে নিয়ে ব্যাপক জ্বালাময়ী সভা, উত্তেজিত আলোচনা হলো খলায়। দেখা গেলো, শালিক, ঘুঘু এইসব পাখি নামের কলংকই যে বড় অপরাধী, সেটা সবারই জানা। এর মাঝে কে বেশি অপরাধী; শালিক, নাকি ঘুঘু এটা নির্ধারণ করার জন্য ব্যাপক যুক্তি তর্ক হলো। আলোচনায় উঠে এলো আরেকটা কালপ্রিটের কথা। দেখা গেলো, কৃষকেরা ইঁদুরকে ভুলে যায়নি; বরং তাকে তার প্রাপ্য আসনে বসিয়েছে অনেকেই। বিশ্লেষণ করে দেখা গেল, সে-ই সবচে' বড় শত্রু। বীজের বস্তা কাটা, চারা হবার পর জালি কাটা, আর ফসল পাকার পর ক্ষেতের ফসল ক্ষেতেই খেয়ে ফেলা-প্রতি পদে পদে এইসব ধ্বংসাত্মক কাজের ধারাবাহিকতা চালু রেখেছিল সারাটা সময়। ঠিক হলো, সবার আগে ইঁদুর নিধন, তারপর দেখা হবে ঐসব পাখি নামের কলংক। পোকা মাকড় ও অনেক ফসল নষ্ট করে। পোকা মাকড় ছোট বলে একে ছোট করে দেখার কিছু নেই বলে অনেকেই একমত হয়। সিদ্ধান্ত হয় একেও দমন করা হবে কঠোর হস্তে। আলোচনা চলতে পারতো আরো, তবে চলল না। সন্ধ্যা নেমে যেতেই সবাই উসখুস করতে শুরু করল। উঠা দরকার, কাল মহাজনি ট্রাক আসবে। বেচার জন্য ফসল তৈরি রাখতে হবে। টাকা দরকার সবার। এইসব দুশমনদের দমন আলোচনা করা যাবে আরো, প্রয়োজনে আরো সভা করা হবে, তবুও এদের কোন ছাড় দেয়া হবে না। সামনের বার তো একেবারে শুরুতেই দেখিয়ে দেয়া হবে কত ধানে কত চাল। সবাই সিদ্ধান্ত নেয়। জ্বালাময়ী সভা শেষ হয়। বাড়ির পথ ধরে সবাই ভাবে, যদি ফসলের মূল্যটা একটু বাড়িয়ে পাওয়া যেত, তাহলে সব ক্ষতি পুষিয়ে যেত; খরচ উঠে বছর চলার মত ব্যবস্থা প্রায় হয়েই যেত! কিন্তু মহাজন কেন শালিক ঘুঘু ইঁদুর পোকামাকড়ের করা ক্ষতির ভর্তুকি দেবে

চোখ

অস্ত্র উদ্ধার অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব পড়ল কমান্ডার মুস্তাফিজের কাঁধে। চৌকস অফিসার বলতে যা বোঝায়, সে তা-ই। এগারোটা মার্ডার কেসের আসামি কে নিয়ে নিশুতি রাতে হবে অভিযান, যখন আসামির সব সহযোগী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকবে, তখন, ঐ মোক্ষম সময়ে তাদের আস্তানায় চালানো হবে অভিযান। এগারোটা মার্ডার কেসের আসামি যে দলে, সে দলের অস্ত্রসস্ত্র কম হবার কথা নয়। সন্ধ্যায় আসামির কাছে গেলেন মুস্তাফিজ, বললেন, "তোকে নিয়ে অস্ত্র উদ্ধারে যাব। কি খেতে চাস বল। ভালো মন্দ খেলে তোর মাথা খুলবে, ঠিকঠাক বলতে পারবি কোথায় অস্ত্র লুকানো আছে। " এগারোটা মার্ডার কেসের আসামির খুব একটা ভাবান্তর দেখা গেল না। খুব আহামরি কিছু খেতে চাইল না সে। গরম ভাত, আলু ভর্তা, শুকনা মরিচ ভাজা, মশুরি ডাল চচ্চরি, আর মিষ্টি দই, আর শেষে জর্দা, শুকনা সুপারি, ও চুন দিয়ে খিলি পান। রাত দশটার দিকে মুস্তাফিজ আবারো গেলেন আসামির কাছে, বললেন, "চল, তোর পরিবারের সাথে দেখা করাই। পরিবারের মানুষদের মুখ দেখলে তোর মন নরম হবে, তুই বুঝবি অস্ত্র কত খারাপ। তখন তুই ঠিকঠিক বলতে পারবি অস্ত্র কই আছে। " এগারো মার্ডার কেসের আসামির বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কমান্ডার মুস্তাফিজ ভাবে, মাদার**র টাকা কই! চাঁদাবাজি, ছিনতাই, খুন করে পাওয়া টাকা করেছেটা কি! বাঞ্চোত এতগুলো মার্ডার করছে, আর থাকে এই ঘিঞ্জি এলাকায়! কমান্ডার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দেখে; দোচালা টিনের ঘরের নিচতলায় আসামির দুই কামরার ঘর। দরজা খুলল আসামির বউ; বউয়ের কোলে বাচ্চা, পৌনে দুই বছরের বাচ্চা। বাচ্চা একটা পাতলা

টেট্রন কাপড়ের কুঁচকানো হাফ প্যান্ট পড়া, গা খালি। তাকে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা চলছিল বোঝা যায়। আসামি ঘরে ঢুকলো, বউয়ের দিকে তাকালো, হাত বাড়ালো, বউ বাচ্চাটাকে আসামির কোলে দিল। বাচ্চা আধো ঘুমে আসামিকে দেখলো, "আব বা" বলে ডাকলো, আসামির গলা পেঁচিয়ে ধরে কাধে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করে ফেলল। আসামির বউ ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করেছে কখন কেউ খেয়াল করেনি; কিংবা খেয়াল করলেও সেটা স্বাভাবিক ঘটনা জ্ঞানে কেউ আমলে নিল না। হ্যান্ডকাফ পড়া হাতে আসামি বাচ্চাটাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো। বউয়ের সাথে আসামির কোন কথা হলো না, ঘরে মা ছিল, মা কে দেখা যাচ্ছে না, সে কথাও জিজ্ঞেস করলো না, কেবল বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে রইল।

দশ মিনিটের বেশি হয়ে গিয়েছিল, কমান্ডার মুস্তাফিজ আসামিকে তাড়া দিল, "এই, চল, রাত বেড়ে যাচ্ছে! পরে তোর সাঙ্গোপাঙ্গদের নাগাল পাবো না। চল চল। "কমান্ডারের কথায় আসামির কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। দেখে মনে হলো সে যেন কমান্ডারের কথা শুনতেই পায়নি। বাচ্চা কোলে সে যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনি দাঁড়িয়ে রইলো। কমান্ডার মুস্তাফিজ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলো। সারা সন্ধ্যা আসামি খুব শান্ত, খুব বিনয়ী আচরণ করেছে, যখন যা বলা হয়েছে, সাড়া দিয়েছে; এই প্রথম সে কমান্ডারের কথা অমান্য করলো। আসামির কোন ভাবান্তর নেই দেখে আবারো তাড়া দিলো, এই চল!" এবারও আসামির মাঝে কোন বিকার নেই। সে তার বাচ্চা কোলে দাঁড়িয়ে থাকলো। কমান্ডার মুস্তাফিজের মাথায় রক্ত চড়ে গেলো। "বাঞ্চোত কথা কানে যায় না!" বলে বাচ্চাটাকে একটানে আসামির কাছ থেকে নিয়ে তার বউয়ের কোলে চাপিয়ে দিলো সে। বাচ্চাকে কোল থেকে কেড়ে নিতেই আসামি ঝট করে কমান্ডার মুস্তাফিজের দিকে তাকালো। কোন কথা বলল না। তাকিয়ে থাকলো। আসামি কমান্ডার মুস্তাফিজের চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকল। কয়েক সেকেন্ড। মাত্র কয়েক সেকেন্ড। কমান্ডার মুস্তাফিজ কোল থেকে সন্তান ছিনিয়ে নেয়া এগারটা মার্ডার কেসের আসামি বাপের চোখ দেখলো। সে চোখে, সে দৃষ্টিতে একটা কিছু ছিল। একটা কিছু, যা কমান্ডার মুস্তাফিজ ধরতে পেরেও পারলো না। একটা কিছু যা তার কাছে ব্যাখ্যার অতীত মনে হলো। কমান্ডার মুস্তাফিজ চোখ ফিরিয়ে নিলেন, টেনে আসামিকে ঘর থেকে বের করলেন, এবং অস্ত্র উদ্ধারে গেলেন। কালের পরিক্রমায় কমান্ডার মুস্তাফিজ নিজেকে লিভিং লিজেন্ড-এ পরিণত করেছেন। দ্রুত পদোন্নতি পেয়েছেন। সাফল্য এনেছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিটি মিশন থেকে। বয়স পঁয়তালিশ পেরিয়েছে, তবুও প্রশিক্ষণে খাটেন পশুর মত। আজ তার মতো এতটা দু:সাহসী, এতটা কষ্টসহিষ্ণু অফিসার পুরো বাহিনীতে আরেকজন নেই। অস্ত্র উদ্ধারে তার অভিযানের সংখ্যা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। সেই কমান্ডার মুস্তাফিজ একজন উদাহরণ এখন। মুস্তাফিজ বিয়ে করেননি। সন্তান কোনোদিন তার চোখে চোখ রাখবে, এটা তিনি হতে দিতে চাননি।

লেখক: উপ-কর কমিশনার, কর অঞ্চল-১, ঢাকা

দারুচিনি দ্বীপ ভ্রমণ

মোঃ জাহিদুল ইসলাম

সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে ; বলেছে সে, ‘ এতদিন কোথায় ছিলেন?’

বিংশ শতাব্দীর আধুনিকতম কবি জীবনানন্দ দাশ ছিলেন প্রকৃতি ও প্রেমের যোগসূত্রের কবি। আজ অবশ্য কবি জীবনানন্দকে নিয়ে লিখতে বসিনি। তার কবিতায় যে দারুচিনি দ্বীপের কথা এসেছে সেই দ্বীপে ভ্রমণ নিয়েই আজ আমার এ লেখা। অবারিত নীল জলরাশির আহ্বানে ছুটে গিয়েছিলাম দারুচিনি দ্বীপে। শুধু কয়েকজন বন্ধুরা মিলেই সেন্ট মার্টিনের দ্বীপে বেরাতে যাওয়া। সাথে ছিলনা অর্ধাঙ্গী বা ছেলেমেয়েরা। মনে হচ্ছিল সেই কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের সময়গুলোতে ফিরে গেছি। যখন প্রকৃতির সবুজ শ্যামলে হারিয়ে খুঁজে পেয়েছি নিজেকে।

ঢাকা থেকে সরাসরি টেকনাফ যাত্রা করলাম। উদ্দেশ্যে দারুচিনি দ্বীপে দুটো দিন নির্ভাবনায় কাটানো। হিম হিম ঠাণ্ডায় সকালে টেকনাফ পৌঁছে হৈ-হুল্লোড় করে সেন্ট মার্টিনস দ্বীপে যাওয়ার জাহাজে উঠে পড়লাম। নাফ নদীর বুক চিরে জাহাজ এগিয়ে চলল। এ যাত্রায় জাহাজের সাথে আরো পাঁচটি জাহাজও ছিল। আমাদের জাহাজটি ছিল সবার আগে। তবে এ রুটে গ্রীণলাইনের জাহাজটি ছোটে অনেক দ্রুত। একপাশে বাংলাদেশ আর অন্যপাশে মিয়ানমার। জাহাজ ক্রমশ টেকনাফকে অতিক্রম করছে। সবুজ পাহাড় আর স্বচ্ছ নদী মিলেমিশে একাকার। ক্রমেই আমরা টেকনাফ স্থলবন্দর, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের পরিদর্শন বাংলোঅতিক্রম করলাম। নদীর জল রবির কিরণে ঝিকিমিকি করছে। নদীতে ছোট বড় ইঞ্জিনচালিত নৌকাগুলো ব্যস্ত তাদের দৈনন্দিন কাজে। দূর হলেও মিয়ানমার সীমান্তের নীল পাহাড় আর কাঁটাতারের বেড়া জাহাজে বসেই দেখা যাচ্ছে। জাহাজে যাত্রীগণ কেউ গল্প করছে, কেউবা ছবি তুলতে ব্যস্ত। আর কেউবা এই অবসরে একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছেন। আমাদের জাহাজের সারেং মাঝেমধ্যেই মাইকে জাহাজের অবস্থান ও আশপাশের বর্ণনা দিচ্ছেন। এবং জাহাজের ভারসাম্য রক্ষায় আমরা যেন যত্রতত্র ঘোরাঘুরি না করে নিজ নিজ সীটে বসি সেবিষয়ে সতর্ক করছিলেন। শাহপরীর দ্বীপ অতিক্রম করে আমাদের জাহাজ বঙ্গোপসাগরে। জাহাজটা মনে হয় কছিটা দুলে উঠলো। চারিদিকে নোনা নীল জলরাশি। টেকনাফ উপকূল ছাড়িয়ে কিছুটা দূরে সমুদ্রের পানি আছড়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে নতুন চর, জাগার অপেক্ষায় ঘুমিয়ে আছে। কে একজন হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো সেন্টমার্টিন বলে। জাহাজ থেকেও ঘোষণা দিল দূরেই দারুচিনি দ্বীপ দেখা যাচ্ছে। সেন্ট মার্টিনস দ্বীপের জেটিতে জাহাজ ভিড়লো। আমার কাছে জাহাজে বসে দূর থেকেই দারুচিনি দ্বীপকে অনেক বেশি আকর্ষণীয় লাগছিল। জাহাজ থেকে নেমেই ছুটতে হলো রিসোর্টের দিকে। জেটিতে ভ্যানগাড়ি ছিল তাতেই তল্পিতল্পাসহ উঠে পড়লাম। এসময় ভাড়াটা অনেক বেশি থাকে। তবে জাহাজগুলো জেটি ত্যাগ করার সাথে সাথে ভাড়াও তুলনামূলক ভাবে অনেক কমে যায়।

রিসোর্টে আমাদের জন্য পূর্বে থেকেই অগ্রিম রুম বুকিং দেওয়া ছিল। রিসোর্টে পৌঁছে জিনিসপত্রাদি কোনরকমে রুমে রেখে পোশাক পরিবর্তন করে ছুটলাম সৈকতের পানে। আমরা ছিলাম সাতজন সাথে বিচ থেকে ফারুক নামে আরও একজনকে সংগ্রহ করে কিছুক্ষণ ফুটবল খেলা হল। ফলাফল ছিল ১-১ এ অমিমাংসিত। ফুটবলটা আমরা ঢাকা থেকেই নিয়ে এসেছিলাম। এরপর নীল জলে স্নান আর ফুটবল তখন হয়ে গেল হ্যান্ডবল। আমরা ছিলাম দ্বীপের পশ্চিম দিকে। সৈকতের এ দিকটাতে প্রবালের পরিমাণ বেশি। তাই এখানে গোসল করতে অনেক সাবধানী হতে হয়। দুপুরের খাওয়া শেষে আজ বিকেলে সৈকতে হেঁটে বেড়ালাম। সমুদ্রের হিমেল হাওয়ার পরশ বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিল। সন্ধ্যা হয়ে এল। কাছেই দেখা গেল বেশ কয়েকজন সমুদ্রের বিভিন্ন ধরনের তাজা মাছের পশরা নিয়ে বসেছে। সবুজ ছোপ ছোপ রঙের লবস্টার গুলো ছিল ইয়া বড়। সাথে ছিল রূপচাঁদা, কোরাল, টুনা, উড়ুক্কু, সুন্দরী মাছ, কাঁকড়া আরো কত কি। রাতে খাওয়ার পরে বন্ধুরা মিলে আড্ডা দিলাম রিসোর্টের লবিতে বসে। যেখান থেকে দিনের আলোয় সমুদ্রের নীল জলরাশির পুরোটা দেখা যায়। রাতের এ সময়টা পূর্ণ জোয়ার চলছে।

দুর্ভাগ্য সাথে পূর্ণিমা ছিলনা ছিল অমাবস্যা। অন্ধকার হলেও সমুদ্রের গর্জনে মোহিত না হয়ে আর কোন উপায় ছিল না। সমুদ্রের ঢেউগুলো আমাদের রিসোর্টের অনতিদূরেই আছড়ে পড়ছিল।

ভ্রমনের দ্বিতীয় দিন সকলে একই ধরনের টি-শার্ট পড়ে গেলাম ছেঁড়াদিয়া বা ছেঁড়া দ্বীপ। আমি ইতিপূর্বে ছেঁড়া দ্বীপে কয়েকবার গিয়ে থাকলেও পুরো অংশটা ঘুরে দেখা হয়নি। তাই এবার ইচ্ছাছিল পুরো দ্বীপটি ঘুরে দেখার। ছেঁড়া দ্বীপ বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের স্থান। সেন্ট মার্টিনস দ্বীপ থেকে স্পীড বোটে করে রওনা দিলাম ছেঁড়া দ্বীপ। খুব কম সময় প্রায় পনের মিনিটের মধ্যে পৌছে গেলাম। ইঞ্জিন চালিত বড় নৌকাতেও যাওয়া যায় তবে সময় কিছুটা বেশি লাগে। আর কিছু রিসোর্টের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ছাওনীওয়ালা স্পীড বোটও পাওয়া যায় তবে ভাড়া কিছুটা বেশি। ছেঁড়া দ্বীপটি আয়তনে ৫০০-৮০০ বর্গমিটার হবে। তবে এখানকার পানি অনেক স্বচ্ছ, নীলাভ এবং লবণাক্ত। দ্বীপে নেমে কোনদিকে যাব প্রথমে বুঝতে পাররছিলাম না। পরে আমরা তিন বন্ধু উত্তরদিকে হাঁটতে থাকলাম। বাকি চারজন গেল দক্ষিণদিকে। তখন ভাঁটা শেষ হয়ে জোয়ার শুরু হয়েছে। প্রবালশ্রেণি পার হয়ে কেয়াবনের উঁচু ঢিপি চোখে পড়ল। আমরা যেখানে প্রথমে নেমেছিলাম সেখানটায় কেয়া গাছের ঝোপটি ছিল অনেক বড়। দুটি ছেলেকে দেখলাম সাইকেল কাঁধে করে আমাদের দিকে আসছে। জিজ্ঞেস করতে বলল সেন্ট মার্টিনস দ্বীপ থেকে সাইকেল চালিয়ে ছেঁড়া দ্বীপে এসেছে। তবে কিছু অংশে নৌকাতে করে পার হতে হয়েছে। আমরা তাই আরো সামনের দিকে হাঁটতে থাকলাম। দুই দিক হতে নীল জলরাশি এসে আমাদের পদযুগলকে ভিজিয়ে দিল। নিঃসীম আনন্দে পুলকিত হলাম। আরো কিছুটা সামনে গিয়ে দেখি একটি নৌকা পারাপারে ব্যস্ত। ওপারটা সেন্ট মার্টিনস দ্বীপ। দ্বীপ আর আমাদের মাঝে দূরত্ব প্রায় ১০০মিটার। এই অংশটিতে ভাঁটার সময় পানি কমে গেলে হয়তো হেঁটেই পার হওয়া যায়। ছেঁড়াদ্বীপে এসে যতটা আনন্দিত আর শিহরিত হয়েছিলাম যত্রতত্র প্লাস্টিকজাত সামগ্রী সৈকতে পড়ে থাকতে দেখে মনটা ততটাই ভেঙে গেল। আমরা কেন প্লাস্টিকের জিনিসপত্র ফেলে দ্বীপটিকে হুমকিতে ফেলছি। দ্বীপের দক্ষিণে প্রবালের আধিক্য রয়েছে। অনেকেই এসেছেন এখানে। সমুদ্রজলে ভিজছেন আর ছবি তুলছেন। ছেঁড়াদ্বীপের নীল জলরাশিতে অবগাহিত হয়ে অবশেষে পুনরায় গতিময় নৌকাতে চেপে সেন্ট মার্টিনস দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

বিকালে সকলে মিলে সাইকেল ভ্রমনে বের হলাম, পুরো সেন্ট মার্টিনস দ্বীপটিকে দেখার জন্য। তবে এ কাজটি করার উপযুক্ত সময় বোধহয় সকালবেলা। আর ভাঁটার সময় জেনেই বের হওয়া ভাল। তাছাড়া হেঁটেও পুরো দ্বীপটিকে দেখা যায়। তবে সাইকেল চালানোর ক্ষেত্রে বেশ কিছু জায়গায় বিশেষ করে দক্ষিণদিকে প্রবাল থাকায় সাইকেল চালানো সম্ভব নয়। আর রাস্তা ধরে গেলে কিছুদূর যাওয়ার পর পাকা রাস্তা শেষ হয়ে বালুময় কাঁচা রাস্তা শুরু হয়েছে। ফলে সাইকেল চালানোর ক্ষেত্রে কিছুটা অসুবিধা হতে পারে। রাতে হোটেল ব্লু মেরিনে ছিল বার-বি-কিউ এর আয়োজন। সামুদ্রিক কোরালের বার-বি-কিউ করা হয়েছিল। আর সস দিয়ে সালাদের উপকরণটিও ছিল চমকপ্রদ। তবে বার-বি-কিউ করতে গেলে পূর্বে থেকে জানিয়ে রাখা ভালো। আজ সারাদিন অনেক ধকল গেছে। রিসোর্টে ফিরে যে যার রুমে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত থাকায় দ্রুত ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমরা যে রিসোর্টে ছিলাম সেটি ছিল দ্বীপের পশ্চিম দিকে। তাই পশ্চিম দিকের সৈকতে আমরা প্রথম দিনেই গোসল করেছিলাম। শেষের দিন দ্বীপের পূর্বদিকের সৈকতে গোসলের পরিকল্পনা করা হল। সৈকতের এ অংশে প্রবাল নেই বললেই চলে এবং পানি অনেক স্বচ্ছ থাকায় নিচের বালি পরিস্কার দেখা যায়। পানিতে বেশিক্ষণ থাকার সুযোগ ছিল না। কারণ আজ দুপুরের জাহাজে করে আমাদের ফিরতে হবে। সেন্ট মার্টিনস দ্বীপে আসার আগে আমার মনে হয়েছিল এখানে দুদিন থাকা অযথাই। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে জাগতিক ভাবনা দূরে ঠেলে আরো এক-দুদিন থাকাই যায়। দুপুরে ফিরতি জাহাজে সকলে উঠে পড়লাম। নোঙর ফেলে রাখা অন্যান্য জাহাজগুলোর সাথে পর্যায়ক্রমিক ভাবে আমাদের জাহাজও জেটি ছেড়ে দিল। দূরে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর ধূসর রঙের জাহাজ গুলো দেখা যাচেছ। মনে হচ্ছে দারুচিনি দ্বীপকে তারা গার্ড অব অনার জানাচ্ছে। দ্বীপ থেকে আরো দূরে চলে এলাম। এখন দ্বীপকে বেশ ঝাপসা দেখাচ্ছে। দ্বীপকে দূর থেকে ধূসর মনে হলেও স্মৃতিতে অম্লান হয়ে থাকবে এই ব্যাচেলর ভ্রমন।

আবারো হাঁটতে চাই বালুকাবেলায়
একসাথে, যখন অলস বিকেল
তার ছায়া ফেলে সাগর সৈকতে।

কৃতজ্ঞতা ঃ ডাঃ শাহীন হোসেন জুয়েল যার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও দক্ষতায় আমাদের এ ভ্রমনটি সার্থক হয়েছিল। আর সেই সকল বন্ধুদের যারা ভ্রমনে অংশ নিয়েছিল।

লেখক: উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, নাটোর গণপূর্ত উপ-বিভাগ, নাটোর

ভ্রমণ কাহিনী

শ্রীলঙ্কা : এশিয়ার বিস্ময়

ইনামুল হক সাগর

শ্রীলঙ্কাকে বলা হয় এশিয়ার বিস্ময়। তো সেই দেশটিতে যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল ২০১৩-তে। ৩০ জুন-০৯ জুলাই ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত একটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করি। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ভিন্ন ভিন্ন ক্যাডারের ৩৭ জন তাতে অংশ নেই। ট্রেনিং এর মূল উদ্দেশ্য ছিল শ্রীলঙ্কার সরকার, প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং আইসিটিসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ধারণা লাভ করা। পাশাপাশি একই বিষয়ে আমাদের দেশ সম্পর্কে ওদের জানানো ; অর্থাৎ ইতিবাচক বিষয়গুলো একে অপরকে জানানো এবং অভিজ্ঞতাগুলো নিজ দেশের উন্নয়নে কাজে লাগানো। খুব ভাল কিছু অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে চমৎকার একটি দেশে নির্মল আনন্দে আমাদের সময়গুলো দ্রুতই যেন ফুরিয়ে যায়।

শ্রীলঙ্কার কাছ থেকে শেখার মতো বিষয় অনেক রয়েছে। সত্যি অভিভূত হবার মতো সেগুলো। শ্রীলঙ্কানদের শৃঙ্খলাবোধ, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং দেশপ্রেম রয়েছে তীব্রভাবে।

শ্রীলঙ্কার Adminstrative রাজধানী Sri Jayawardenepura Kotte, আর Commercial রাজধানী Colombo. শ্রীলঙ্কার ইতিহাস বহু পুরোনো। আয়তন ৬৫৬১০ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা মাত্র ২ কোটি। শিক্ষার হার শতভাগের কাছাকাছি। ৩০ বছরের গৃহযুদ্ধ কাটিয়ে দেশটি আশ্চর্য গতিতে এগিয়ে চলছে সমৃদ্ধি পথে।

৩০ জুন, ২০১৩ দুপুর ৩ টায় আমরা কলম্বো এয়ারপোর্টে পৌঁছি। ঢাকা থেকে তিন ঘণ্টা লেগেছে শ্রীলঙ্কায় পৌঁছতে। এয়ারপোর্টে প্রয়োজনীয় কাজ সেড়ে সবাই মোবাইল সিম কেনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ি। কেউ কেউ শ্রীলঙ্কার প্রাইভেট অপারেটরগুলোর সিম কেনে আবার কেউ কেউ সরকারি অপারেটর সিম কেনে। বেশির ভাগই কেনে প্রাইভেট অপারেটরগুলোর সিম। আমরা যারা তাড়াতাড়ি সিম চালু করার আশায় প্রাইভেট কোম্পানিগুলোর সিম কিনলাম তাদেরটা চালু হয় পরদিন সকালে, আর যারা সরকারি অপারেটর সিম কেনে তাদেরটা ১০ মিনিট পরই চালু হয়ে যায়। এয়ারপোর্ট থেকে বাসে উঠেই দেখলাম তারা দেশে কথা বলা শুরু করেছে। যাই হোক, দেড় ঘণ্টা পথ পেরিয়ে আমরা পৌঁছলাম SLIDA-তে। SLIDA হলো Sri Lanka Institute of Development Administration; কলম্বোর মালালাসাকারা মাওয়াথা নামক স্থানে অবস্থিত। SLIDA শ্রীলঙ্কান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যাডার অফিসারদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ক্যাফেটেরিয়াতে রাতের খাবার সেড়ে নেই। প্রথম প্রথম শ্রীলঙ্কার খাবারের সাথে মানিয়ে নিতে একটু কষ্ট হয়। সমস্যা হলো ওরা বেশির ভাগ খাবারে এক ধরনের পাতা দেয় যেটা খাবারের স্বাদকে পাল্টে দেয়, অন্যরকম গন্ধ লাগে, সেটার সাথে আমরা অভ্যস্থ না। ফলে তা আমাদের অস্বস্থির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শ্রীলঙ্কানরা ঝাল পছন্দ করে। মরিচের ভর্তা খুব প্রিয় ওদের। সকাল বেলা ওরা প্রচুর খায়। খুব সকাল সকাল কাজে বেরিয়ে পরে। দুপুর ও রাতে খাবার খায় কম।

প্রথম রাতেই আমরা ক'জন বেরিয়ে পরলাম গল ফেইস এর উদ্দেশ্যে। ভারত মহাসাগরের তীরে বসে সারাদিনের ক্লান্তি কোথায় যেন উবে গেল। সমুদ্রের গর্জন, শীতল আবহাওয়া, চোখের সামনে ঢেউগুলোর আচড়ে পরা এক মোহনীয় দৃশ্যের অবতারণা করে। বসার জন্য সুন্দর ব্যবস্থা সেখানে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমাদের কয়েক ঘণ্টা যেন নিমিষেই কেটে যায়।

শ্রীলঙ্কার Public Administration & Home Affairs এর Secretary Mr. P. B. Abeykoon আমাদের প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন। আমরা আমাদের জাতীয় সংগীত গাই, শ্রীলঙ্কানরা তাদেরটা। পুরো প্রশিক্ষণকালিন সময়টায় বিভিন্ন দিন স্ব-স্ব ক্ষেত্রের Resource Person রা আমাদের সাথে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।

শ্রীলঙ্কার রাস্তায় যানজট নেই বললেই চলে। প্রশ্ন আসতে পারে ওদেরতো জনসংখ্যা অনেক কম। কিন্তু যানজট না থাকার পেছনে বড় যে কারণটি চোখে পড়ার মতো তা হলো ওরা পুরোদস্তর ট্রাফিক আইন মেনে চলে। লাল ও সবুজ বাতি মানবে না এটা শ্রীলঙ্কায় হবার নয়। শ্রীলঙ্কায় যে ক'দিন ছিলাম কখনও এর ব্যতিক্রম হতে দেখিনি ; সেটা কলম্বোতেই হোক বা শহরের বাইরেই

হোক না কেন। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। শ্রীলঙ্কা থেকে আমাদের দেশে ফেরার ফ্লাইট ছিল ভোর ৬ টায়। ভোর ৪ টার মধ্যে চেক-ইন হতে হবে। SLIDA থেকে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে আমাদের বাস যাত্রা শুরু করলো রাত ২ টায়। দেড় ঘণ্টার পথ। এতো রাত, রাস্তা একদম ফাঁকা। কোথাও কোন জনমানব বা গাড়ি নেই বললেই চলে। অথচ রাস্তা একদম ফাঁকা পেয়েও আমাদের বাস চালক লাল বাতি সবুজ বাতি মেনে গাড়ি চালালো। আমরা অনেকেই বাসে ঘুমাচ্ছিলাম। হঠাৎ একবার ঘুম ভেঙে দেখি আশেপাশের ত্রিসীমানায় কোন গাড়ি নেই, লাল বাতি জ্বলছে, আমাদের বাসও যথারীতি দাঁড়িয়ে আছে। এমনকি রাস্তা ফাঁকা থাকা সত্ত্বেও চালক নির্দিষ্ট গতিসীমার বাইরে গাড়ি চালায়নি। আইনের প্রতি এমন শ্রদ্ধাবোধ থাকাটাইতো স্বাভাবিক। অথচ এই স্বাভাবিক বিষয়টি আমাদের কাছে কেন জানি অনেক বড় আশ্চর্যের বিষয় মনে হলো!

শ্রীলঙ্কানরা চলাচলের জন্য রাস্তার ফুটপাত ব্যবহার করে। ওদের ফুটপাতে অবশ্য আমাদের মতো ভ্রাম্যমাণ দোকান গড়ে ওঠেনি ; ওটা শুধুই হাঁটার জন্য। রাস্তা ক্রস করতে হলে অবশ্যই ওরা জেব্রা ক্রসিং ব্যবহার করে। মজার বিষয় হলো জেব্রা ক্রসিংএ কোন পথচারী পা দিয়েছে তো সব গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে! পথচারী সম্পূর্ণ রাস্তা অতিক্রম না করা পর্যন্ত গাড়িগুলো স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। চালকদের চোখে-মুখে নেই বিরক্তির ছাপ। শ্রীলঙ্কায় যাবার পর আমরা যারপরনাই নিয়ম মেনে চলতে চেষ্টা করেছি। ভুল করেও জেব্রা ক্রসিং ছাড়া রাস্তা পার হইনি বা ফুটপাত ছাড়া হাঁটিওনি। আমাদের টিমের এক সদস্য একবার মজা করার জন্য বা পরীক্ষা করার জন্যও বলা যেতে পারে জেব্রা ক্রসিং-এ দুই কদম গিয়ে আবার পেছনে সরে এলো। আমাদের কাছে অদ্ভুত লাগলো গাড়িগুলো সব দাঁড়িয়ে গেছে, চালকরা ওকে ইশারা করছে রাস্তা পাড় হবার জন্য। ও রাস্তা অতিক্রম করার পর গাড়িগুলো গেলো। হ্যাঁ আমাদের কাছেতো অদ্ভুত লাগবারই কথা। মনে মনে খুব লজ্জিত হলাম, মনের অজান্তেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম কোথায় আমরা!

শ্রীলঙ্কায় পাবলিক ট্রান্সপোর্ট পর্যাপ্ত রয়েছে। বাস, অটোরিকশা সবসময়ই হাতের নাগালে। প্রাইভেট কারের সংখ্যা কম। শ্রীলঙ্কায় দেখলাম বেশির ভাগ লোক ইংরেজি বোঝেন এবং কম-বেশি বলতেও পারেন। আমরা শহরে যখন ঘুরেছি তখন অটোরিকশাতেই ঘুরেছি। অটোরিকশা চালকদের সাথে কথা হতো, ওদের চিন্তা-চেতনা বোঝার চেষ্টা করতাম। বেশির ভাগই ইংরেজি বুঝতো এবং মোটামুটি বলতে পারতো। যখন শুনতো আমরা বাংলাদেশ থেকে এসেছি তখন বাংলাদেশ সম্পর্কে জানতে চাইতো। কেউ কেউ বলতো তোমাদের ক্রিকেট খেলা দেখি, সাকিব খুব ভাল খেলে ইত্যাদি।

ঝখওউঅ তে ফিরতে ফিরতে আমাদের প্রায়ই রাত বারোটা-একটা বেজে যেতো। তবে আমাদের কখনও কোন অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়নি। শ্রীলঙ্কানরা সত্যিই অতিথিপরায়ণ। অটোরিকশা চালক থেকে শুরু করে সবাই জানে যে পর্যটন তাদের আয়ের অন্যতম উৎস। সবার কাছ থেকে আমরা ভাল ব্যবহার ও সহযোগিতা পেয়েছি। অটোরিকশাগুলো প্রায় সবগুলোই মিটারে চলে। অল্প কিছু আছে মিটার ছাড়া ; কিন্তু তারাও ন্যায্য ভাড়া হাঁকে। স্বস্তির বিষয় হলো ওদের জিজ্ঞেস করতে হয় না যে ওখানে যাবে কিনা! বললেই হয় ওখানে যাবো, সেটা যত কাছে বা দূরেই হোক তাদের না করতে দেখিনি। বলার আগেই মিটার চালু। একদিন রাতে গল ফেইস বিচ থেকে ফেরার পথে মিটারে ট্যাক্সি না পেয়ে আমি আর আমার দুই সহকর্মী একটা অটোরিকশা ভাড়া করলাম দুইশো রুপিতে। রাতের বেলা আমরাও খেয়াল করতে পারিনি, চালকও রাস্তা ঠিক চিনতে না পেরে অন্য রাস্তায় চলে যায়। অনেক সময় ধরে ঘুরে অবশেষে আমরা ঝখওউঅ তে এসে পৌঁছলাম। মিটারে আসলে ভাড়া ৫০০ রুপির কম উঠতো না। যেহেতু আমরা ২০০ রুপিতে ঠিক করেছিলাম, আর এতো পথ ঘুরে এসেছি আমরা কিছু বেশি দিতে চাইলাম। অথচ আশ্চর্য বিষয় হলো অটোরিকশা চালক বার বার দুঃখ প্রকাশ করছিল। আর বলছিল তোমরা তো এখানে নতুন, তোমাদেরতো চেনার কথা নয়। আমার ভুল হয়েছে, তাই আমাকে বেশি দেবার দরকার নেই। আমাদের দেশে হলে বিষয়টি কি দাঁড়াতো তা ভাবতে ভাবতে নিরবে যার যার রুমে চলে গেলাম।

০৫ জুলাই, ২০১৩ খ্রিঃ সকাল ৮টায় আমরা শ্রীলঙ্কার ঐতিহাসিক স্থান সিগিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। অনেক দূরের পথ। পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা ২ টা বেজে যায়। প্রাচীন নগর পরিকল্পনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সিগিরিয়াকে ১৯৮২ সালে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে ঘোষণা করে ইউনেস্কো। রাজা প্রথম কশ্যপ শ্রীলঙ্কা শাসন করেছেন ৪৭৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৪৯৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তখন অবশ্য দক্ষিণ এশিয়ার এ দেশটিকে শ্রীলঙ্কা নামে কেউ চিনত না। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত দেশটিকে সিলন নামেই চিনত সবাই। রাজা প্রথম কশ্যপ সিংহাসনে আরোহণের পর সিলনের নতুন রাজধানী নির্বাচন করেন সিগিরিয়াকে। প্রাচীন এ রাজধানীর বেশির ভাগই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সামান্য যে ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া যায়, এর মধ্যে অন্যতম একটি হলো কশ্যপের রাজপ্রাসাদের কিছু অংশ। কশ্যপ তার প্রাসাদটি বানিয়েছিলেন অনেকটা বিচ্ছিন্ন এক পাহাড়ের উপর। সাধারণ কথায় এটিকে পাহাড় বলা হলেও ভূতত্ত্ববিদরা একে ডাকেন ইন্সেলবার্গ বলে। ইন্সেলবার্গ বলতে মূলত বিশালাকার, বিচ্ছিন্ন একটি পাথরকে বোঝায়। অনেকে আবার এগুলোকে পর্বত বলেও ডেকে থাকেন। সিগিরিয়ার অবস্থান বর্তমান শ্রীলঙ্কার মাটেলা জেলায়। স্থানীয়দের মধ্যে এটি সিংহপাথর নামেও পরিচিত। এই সিংহপাথরটির উচ্চতা প্রায় ২০০ মিটারের কাছাকাছি। বর্তমানে পৃথিবীতে যত ইন্সেলবার্গ রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো এই সিগিরিয়া। একে তো প্রায় ২০০ মিটার উঁচুতে রাজপ্রাসাদ আবার

পুরো পাথরের চারপাশ ভরিয়ে ফেলা হয়েছিল রঙিন দেয়ালচিত্রে। এছাড়া পাথরের গায়ে খোদাই করা রয়েছে কিছু কবিতা। যেগুলোকে সিংহলি ভাষার প্রাচীন নিদর্শন বলে গণ্য করা হয়। জানলাম প্রাসাদ ও দুর্গ-এ দুটি হিসেবেই ব্যবহৃত হতো এটি। ৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে কশ্যপের পতন ঘটলে সিলনের রাজধানী অনুরাধাপুরে স্থানান্তরিত করা হয়। সিগিরিয়ার একদম চূড়াতে উঠতে সমর্থ হই আমরা ৮/১০ জন। শেষের অর্ধেকটুকু ওঠা অনেকটা ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। সাহস করে উঠে উপর থেকে অপূর্ব দৃশ্য দেখতে পাই। নামার সময় ভেবেছিলাম সহজ হবে। কিন্ত সেটা আরও ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। কারণ সরু সিঁড়ির এক পাশ দিয়ে একদল উপরে উঠে আর একদল নামে। ডানে বায়ে তাকালেই বিপদ! পাশে কিছু নেই। তাই কোনমতে নেমে হাফ ছেড়ে বাঁচি। সেদিন SLIDA-তে ফিরতে ফিরতে রাত ১০ টা বেজে যায়। আমরা দুটো বাস দিয়ে যাতায়াত করি। আশা যাবার পথে সে কি আনন্দই না হয়েছে! দেশে চাকুরির ব্যস্ততার বাইরে যে ক'টা দিন শ্রীলঙ্কায় কাটালাম তা দীর্ঘদিন মনে রাখার মতো।

কলম্বো শহরটি যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা। প্রাচীন স্থাপনা সমৃদ্ধ পরিচ্ছন্ন শহরটির পাশ দিয়ে গেছে ভারত মহাসাগর। ভারত মহাসাগরের জলরাশির সৌন্দর্য শহরে আগত দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করে। মহাসাগরের তীর ঘেঁষে বয়ে চলেছে রেললাইন, পাকা রাস্তা। যাত্রীরা উপভোগ করে অপার সৌন্দর্য। কলম্বো শহরের রাস্তা ঘাটে কোন ধুলো বালি নেই, ছিমছাম গোছানো শহর। সমুদ্রের পাড়ে গল ফেইস নামক স্থানে প্রতি সন্ধ্যায় আমরা যেতাম। সেখানে বিশাল জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে ছোট ছোট ভ্রাম্যমাণ হোটেল। হোটেলগুলোতে সামুদ্রিক মাছ আর মজাদার বিভিন্ন খাবার পাওয়া যায়। আমাদের পছন্দের ছিল নানার হালাল হোটেল'র খাবার। প্রচুর ভিড় লেগে থাকে সেখানে। পাওয়া যায় সব হালাল খাবার। একেকদিন একেক ধরনের খাবার অর্ডার করে সবগুলোর টেস্ট নেবার চেষ্টা করেছি। খোলা আকাশ, সামনে সমুদ্রের ঢেউ এসে আচড়ে পড়ছে, সমুদ্রের গর্জন-অদ্ভুত ভালা লাগা কাজ করেছে। তাইতো প্রতিদিন সন্ধ্যায় সেখানে ছুটে গিয়েছি। শত শত মানুষ সেখানে জড়ো হয়। কিন্তু জায়গাটা বেশ পরিচ্ছন্ন, কেউ নোংরা করছে না। গল ফেইস ঘিরেই গড়ে উঠেছে বিশ্বের নামকরা কিছু হোটেল। কাছাকাছি রয়েছে কয়েকটা ক্যাসিনো। অর্থাৎ পর্যটকদের চাহিদা মেটানোর জন্য খুব পরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে কলম্বো। রয়েছে ম্যাকডোনাল্ডের মতো বিখ্যাত খাবারের দোকান। শ্রীলঙ্কানরা পর্যটকদের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়না কখনো। রয়েছে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর আনন্দ। পর্যটকদের সহযোগিতা করার মনোভাব সর্বাগ্রে।

অফিস পরিদর্শন এবং সম্মক ধারণা লাভের জন্য Information & Communication Technology Agency (ICTA)-তে যাই। বিশাল বড় অফিস। যে ফ্লোরটিতে মূল কাজ হয়, বা সিনিয়র অফিসাররা বসেন সেটি পুরো ফাঁকা। অর্থাৎ আলাদা কোন রুম নেই। ওয়ার্ক স্টেশন করা, সকলের জন্য একই ধরনের বসার ব্যবস্থা। সকলেই সমান, কাজেও ফাঁকি দেবার সুযোগ নেই।

এক বিকেলে আমরা যাই গল ফোর্ট। শ্রীলঙ্কার ঐতিহাসিক নান্দনিক স্থাপনার অন্যতম গল ফোর্ট ১৫৮৮ সালে পর্তুগিজরা স্থাপন করে। এতো পুরোনো কিন্তু যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আজও তা দর্শণার্থীদের জন্য আকর্ষণীয় একটি স্থান। নানান দেশের পর্যটকদের সেখানে পেলাম। সেদিনই যাই কলম্বো ইউনির্ভাসিটিতে। ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীরা আমাদের সাদরে বরণ করে নেয়। ওরা সত্যি অনেক আন্তরিক।

শ্রীলঙ্কায় বেশ কিছু বিচে আমরা যাই। তার মধ্যে অন্যতম Negombo, Mount Lavinia, Unawatuna. Negombo কলম্বো শহর থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত যা অত্যন্ত সুন্দর একটি সী-বিচ। বিচের পাশের দৃষ্টিনন্দন হোটেলগুলো এবং নানান ধরনের জিনিসের দোকানগুলো যেন আকর্ষণ বাড়িয়ে দেয়। Mount Lavinia শহর থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সেখানের প্রবালগুলো দেখে মনে হচ্ছিল আমাদের সেন্টমার্টিন আছি।

শ্রীলঙ্কায় যতগুলো বিচে আমরা গিয়েছি তার মধ্যে সবচেয়ে ভাল লেগেছে Unawatuna. প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, একদম স্বচ্ছ পানি, সি ফুড এর জন্য বিচটি আমাদের সবার কাছে ভাল লাগে। Unawatuna তে আমরা অনেকটা সময় কাটাই। পানি এতো স্বচ্ছ যে অনেক দূর পর্যন্ত নিচের অংশ দেখা যায়। অবশ্য আমার হাতে পরা দীর্ঘ ১০ বছরের একটা আংটির সলিল সমাধি ঘটে এই বিচে। কখন যে সেটা হারিয়ে যায় টেরই পেলাম না। Hilkkaduwa বিচটিও আমাদের ভাল লাগে। এটি শহর থেকে অনেক দূরে, প্রায় ১০০ কিলোমিটার দক্ষিণে।

শ্রীলঙ্কায় আরও অনেক বিচ আছে। যেগুলোতে সময় স্বল্পতার কারণে যাওয়া হয়নি। কারণ প্রশিক্ষণের বিষয়গুলোর উপর জোড় দেওয়াতে আমাদের ঘোড়াঘুড়ির সময়টা কমে যায়। পাঠকদের জানার জন্য আরও কিছু উল্লেখযোগ্য বিচের নাম বলতে চাই-সেগুলো হলো Kalutara, Bentota, Nilaveli, Beruwela, Weligama, Tangalle, Trincomalee, Pasikudali, Mirissa, Arugam bay, Kilaalybeace, Dickwella, Koggala ইত্যাদি।

শ্রীলঙ্কার ক্যান্ডিতেও আমাদের যাবার ইচ্ছে ছিল, কারণ শহরটি নাকি অসাধারণ। কিন্তু যাবার সৌভাগ্য হয়নি। সৌভাগ্য হয়নি Adam's Peak এ যাবার। Adam's Peak বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর লোকদের খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। আমাদের ওখানে যাবার কথা থাকলেও ৭৩৬০ ফুট উঁচু এই ঐতিহাসিক স্থানে ওঠার মতো আবহাওয়া না থাকায় আর যাওয়া হয়নি।

শ্রীলঙ্কায় ইউনেস্কো ঘোষিত বেশ কিছু World Heritage Site রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো Temple of the tooth, Sigiriya, Anuradhapura, Galle, Polonnaruwa, Dambulla, Cave temple, Singaraja Forest, Central Highlands.

শ্রীলঙ্কায় আরো যেসব স্থান পরিদর্শন করি সেগুলো হলো-Independence Memorial Hall, Old Parliament House, Colombo Municipility (White House), Second World War Hero Monument, Nelum Pokura Theatre, National Art Gallery, Colombo National Museum, Beira Lake, Twin Tower ইত্যাদি।

শ্রীলঙ্কায় সবচেয়ে বড় শপিং মল Magestic City. ওখান থেকেই আমরা মূলত টুকটাক শপিং করি। সবাই প্রচুর চা কিনে নিয়ে আসি। শ্রীলঙ্কার চা খুব বিখ্যাত। আর ওদের চা-য়ের প্যাকেটগুলো খুব আকর্ষণীয়। আরেকটি জিনিস মোটামুটি সবাই কিনে নিয়ে আসে। সেটি হলো পাথর। শ্রীলঙ্কায় প্রচুর পাথরের দোকান রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের পাথরের জন্য শ্রীলঙ্কা বিখ্যাত। প্রিয়জনদের জন্য সবাই কম-বেশি সাধ্যের মধ্যে পাথর কিনে আনার চেষ্টা করে।

SSC ক্রিকেট গ্রাউন্ডে শ্রীলঙ্কান এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিসার এবং বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস অফিসারদের মধ্যে ক্রিকেট ম্যাচ এর আয়োজন করা হয়। নাম দেওয়া হয়-Battle of Friendship। দেশে ফেরার আগের দিন দুপুরে এই প্রীতি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। আমরা শ্রীলঙ্কায় ঘোড়াঘুড়িতে ব্যস্ত আর আমাদের বিপক্ষ টিম কয়েকদিন পুরোদমে ম্যাচের জন্য প্রেকটিস করেছে। ওদের প্রচুর সাপোর্টার ছিল। তবে ভাল লেগেছে আমরা ৪/৬ মারলে বা উইকেট পেলে আমাদের উৎসাহ দিতেও দর্শকরা কার্পণ্য করেনি। ১২ ওভারের খেলা ছিল। আমরা আগে ব্যাট করি। বাংলাদেশ দলে খেলার বিরাট সৌভাগ্য হয় আমার। আমাদের প্রথম দুই ব্যাটসম্যান খুব তাড়াতাড়ি আউট হয়ে গেলে আমি মাঠে নামি। কি হলো বুঝতে পারলাম না। কি ভাবছেন মাঠে নেমেই আউট? না তেমনটি হয়নি। মাঠে নেমেই প্রথম চার বলে চারটা ছয় মারি। আমি নিজেই তাজ্জব হয়ে যাই। মাঠে ও গ্যালারিতে তখন চরম উত্তেজনা। যারা ধারাভাষ্য দিচ্ছিল তারা বলছিল আমাদের সাকিব, আরও কত কি! কি কপাল এমনই যে, পরের অভাবে আবারো ছক্কা হাঁকাতে গিয়ে বাউন্ডারি লাইনে ক্যাচ আউট। ১২ ওভারে আমরা ৯৮ রান করি। বোলিং আমরা ভাল করছিলাম। প্রথম ৫ ওভারে ২০ রানে ওদের ৫ উইকেট পরে যায়। আমি ১টি উইকেট পাই, ১টি দুর্দান্ত ক্যাচ ধরি। ম্যান অব দ্য ম্যাচ হবার আশা যখন করছিলাম আর ভাবছিলাম দেশে ফিরে পত্রিকায় বড় নিউজ ছাপানোর চেষ্টা করবো তখনই সব উলট-পালট হয়ে যায়। পরপর তিন ওভারে আমাদের তিন বোলার ৫০ রান দিয়ে দেয়। ইস্, শেষ ওভারে গিয়ে খেলাটা হেরে গেলাম। তবে স্মরণীয় হয়ে রইল Battle of Friendship.

শ্রীলঙ্কানদের মধ্যে দেশপ্রেমের চর্চা বা দেশপ্রেম গড়ে তোলার প্রবণতাটা চোখে পড়েছে। ওরা নতুন প্রজন্মকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করে নিরন্তরভাবে। আমরা শ্রীলঙ্কানদের যেসব গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থাপনা ঘুরতে গিয়েছি প্রায় প্রতিটিতেই কোন না কোন প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের পেলাম, প্রতিষ্ঠান থেকে ওদের দল বেঁধে সেসব জায়গায় নিয়ে যায়। ওদেরকে যারা ব্রীফিং করে তাদের কথাগুলো শোনার চেষ্টা করতাম। অভিভূত হলাম এই শুনে যে তারা দেশকে ভালবাসার মন্ত্র দিয়ে যাচ্ছে সুন্দরভাবে এবং নতুন প্রজন্মকে উজ্জীবিত করছে সঠিকভাবে গড়ে উঠতে। প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সাথে কথা হলো, তারা জানালেন যে শ্রীলঙ্কার সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের সাথে পরিচয় আর ভালবাসা গড়ে তুলতেই তাদের এই আয়োজনগুলো। আরেকটা বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়। SLIDA অর্থাৎ আমরা যেখানটায় থাকতাম সেখানে বিভিন্ন পর্যায়ের সকল প্রশিক্ষণার্থীদের ক্লাস শুরু হয় ৮.৩০ টায়। ঠিক ৮.১৫ এর দিকে বিভিন্ন জায়গায় স্থাপিত ছোট ছোট সাউন্ড বক্সে ওদের জাতীয় সংগীত বেজে উঠতো। জাতীয় সংগীত বাজার সাথে সাথে যে যেখানে আছে সেখানেই দাঁড়িয়ে সমস্বরে গাইতে শুরু করতো। বিশাল ক্যাম্পাসে ঝাড়ুদারদের পর্যন্ত তার কাজ থামিয়ে জাতীয় সংগীত গাইতে দেখলাম। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতাম আর ওদের নিবিড়ভাবে খেয়াল করতাম ; কি যে ভাল লেগেছে!

ভাললাগার সময়গুলো যেন ক্ষণস্থায়ী হয়! চোখের পলকেই যেন কেটে গেল ১০টি দিন। স্মরণীয় কিছু স্মৃতি আর অভিজ্ঞতা নিয়ে আমরা দেশে ফিরি। সদ্য গৃহযুদ্ধ কাটিয়ে ওঠা একটি দেশ, এশিয়ার বিস্ময় কি সুন্দর গতিতেই না এগিয়ে চলেছে। যেখানে শিক্ষার হার অত্যন্ত বেশি, সেখানে সৌভাগ্যের পরশ তো ধরা দিবেই। কি সুন্দর পর্যটকবান্ধব পরিবেশই না গড়ে উঠেছে সেখানে। এয়ারপোর্ট থেকে বাসায় ফিরতে প্রায় ৩ ঘণ্টা লেগে গেল, তাও আবার অফিসের গাড়িতে। যেখানে শ্রীলঙ্কা থেকে আসতে লাগলো মাত্র ৩ ঘণ্টা! যাই হোক আবার ফিরে পেলাম সেই চিরচেনা যানজট, ধুলোবালি. . .! তারপরওতো আমার দেশ, প্রাণের দেশ-বাংলাদেশ। আমার ভালবাসার বাংলাদেশ।

লেখক: অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা

স্মৃতির পটে ভারত ভ্রমণ

মো: নজরুল ইসলাম

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া, ঘর হইতে শুধু দুই পা ফেলিয়া, একটি ধানের শিষের উপর একটি শিশির বিন্দু'। বাস্তবিক পক্ষেই কবির কথাটি চির সত্য। আমরা আমাদের দেশ বা প্রতিবেশি ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ ব্যতিরেকে কেবল ইউরোপ, আমেরিকা কিংবা অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণের জন্যে অস্থির হয়ে পরি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলেছিলেন, 'যদি বিশ্বকে জানতে চাও তাহলে ভারত ভ্রমণে যাও'। আজ হতে প্রায় এক যুগ আগে ২০০৬ সালের কথা। সরকারি খরচে বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্বাবধানে গিয়েছিলাম ভারত ভ্রমণে। সদ্য অনার্স পাশ করা ৩০(ত্রিশ) জন সহপাঠি বন্ধু ছিল আমাদের টিমে। আমাদের টিম লিডার ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের হর্টিকালচার এন্ড পোস্ট হার্ভেস্ট টেকনোলজীর সুযোগ্য প্রফেসর ডঃ মো: নজরুল ইসলাম স্যার। তিনি নরওয়ে থেকে মাস্টার্স এবং পিএইচডি সম্পন্ন করে এসেছেন বাংলাদেশে। স্যার অত্যন্ত বিচক্ষণ, দক্ষ টিম লিডার হিসেবে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

যাইহোক আমাদের সফরের মেয়াদ ছিল ১ (এক) মাস। সেই ভ্রমণের অংশ হিসেবে আজ স্মৃতির পাতা থেকে কিছু অংশ শেয়ার করার প্রয়াস পেলাম। কি যে মজা হয়েছিল সে ভ্রমণে তা বলে শেষ করা যাবে না। অনেক পরিশ্রম হয়েছিল, তবুও আমাদের আনন্দের কাছে তা কিছুই মনে হয়নি। আমরা প্রথমে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শেরেবাংলা হলের মাঠে একত্রিত হয়েছিলাম। সোহাগ পরিবহনের বিশাল লাক্সরিয়াস বাসে আমরা একে একে উঠে বসলাম। সবাব মনে ঈদের মতো আনন্দ লেগেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ভাইয়েরা বাসে আমাদেরকে বসিয়ে ভারত ভ্রমণে তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে লাগলেন। ব্রিফিং শেষে সকলের নিকট বিদায় নিয়ে রাত ০৮.৩০ টায় আমাদের বাস চললো বেনাপোলের উদ্দেশ্যে। পরের দিন সকাল ০৯.০০ টায় আমরা বেনাপোল গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে নেমে হোটেলে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নাস্তা করলাম সবাই। বর্ডার এলাকায় মানি এক্সচেঞ্জ অফিস হতে আমরা টাকাকে ডলার ও রুপিতে কনভার্ট করে নিলাম। এরপর লাইন ধরে বর্ডার পেরিয়ে আমরা সোহাগ পরিবহনের আরেকটি বাসে চেপে রওয়ানা হলাম কলকাতার উদ্দেশ্যে। কলকাতায় যাওয়ার পথে যশোর রোডের দুপাশে বেনাপোল থেকে শুরু করে কলকাতা অবধি বিশাল মোটা-মোটা হাজারো বৃক্ষরাজি দেখে সত্যিই অবিভূত হলাম। এই বৃক্ষরাজি পুরনো অনেক ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাক্ষী হিসেবে সান্ত্রীর মতো এখনোও দাড়িয়ে আছে।

কোলকাতায় নেমে যে জিনিসটি আমার বিবেককে নাড়া দিল তা হলো মানুষের দ্বারা হাতে টানা রিকশা। কলকাতার এক দাদাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এই রিকশা তাদের একটি ঐতিহ্য এটা ব্রিটিশ কাল হতে চলে আসছে। এই রিকশা আবহমান কাল তথা ব্রিটিশদের সৃস্টি। আমরা কোলকাতায় একদিন অবস্থান করে পরের দিন শিয়ালদাহ হতে ট্রেনে করে রওয়ানা হলাম আগ্রার উদ্দেশ্যে। একটানা ৩৬ ঘন্টা ট্রেন ভ্রমণের পর আমরা পৌঁছলাম আগ্রায়। পথিমধ্যে পাহাড়-পর্বত, বন-বাদাড়, মরুভূমি, ফসলি মাঠ সবই চোখে পড়ল। আমরা যখন আগ্রা স্টেশনে পৌঁছলাম তখন ছিল রাত প্রায় ০২.০০টা। চারদিকে নিথর অন্ধকার রাস্তায় তেমন লোকজন ছিলনা। সম্পূর্ণ অজানা ও অচেনা এক দেশ। মাঝে মধ্যে রাস্তায় দু-একটা স্কুটার এর দেখা মিলে। সবাই আমরা এক অজানা আতনে্ক ছিলাম। অনেকক্ষণ পর তিনটি স্কুটার ঠিক করলাম পর্যায়ক্রমে আমাদের ৩০ জনকে হোটেলে নিয়ে যাবে। সবার শেষে ছিলাম আমরা ০৫ বন্ধু। খুবই আতনে্ক ছিলাম আমরা রাস্তায় কখন কি হয় এই ভেবে। যাইহোক অনেক আতনে্কর পরও আমরা ভোর ০৪.০০ টার মধ্যে এক হোটেলে এসে সবার সাথে মিলিত হলাম। সেসময় আগ্রায় ছিল প্রচণ্ড রকম গরম। তাপমাত্রা প্রায় ৪০-৪৫ ডিগ্রির মতো। আগ্রার পানি হচ্ছে মারাত্নক রকমের খর পানি। সাবান গায়ে মাখার পর দেখি সাবান আর আমাকে ছাড়ে না। অতপর পরের দিন আমরা প্রাইভেট কারে করে রওয়ানা হলাম আগ্রাফোর্ট, আগ্রা পার্ক, তাজমহল ও অন্যান্য সকল দর্শণীয় স্থান দেখার উদ্দেশ্যে। আমরা প্রথমেই ঢুকলাম আগ্রা ফোর্টে। মুঘল শাসকদের তৈরি বিশাল রাজপ্রাসাদ দেখে আমাদের চোখ ছানাবরা হয়ে গেল। ফোর্টের ভিতরে দেয়ালে কান পাতলে মনে হয় যেন তৎকালীন রাজ-রাজাদের তরবারি ও ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ এখনও ভেসে আসছে। সুবিশাল ইমারত এ রয়েছে শৈল্পিক কারুকার্য ও দামি দামি পাথরের

সাজ-সজ্জা। আগ্রা ফোর্টের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে খরস্রোতা যমুনা নদী। ভিতরে রয়েছে দরবার হল, নৃত্যশালা, বিশ্রামাগার, স্নানাগার, সুবিশাল ডাইনিং রুম, প্রার্থনা কক্ষ, খেলার মাঠ, মেহমানখানা ও কয়েদিখানা। মুসলিম শাসকরা যে কি পরিমান ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকতো তা আগ্রা ফোর্টে না গেলে বুঝতাম না। বাস্তবিক পক্ষে মুসলিম শাসকদের পতনের অন্যতম কারণ ছিল তাদের মাত্রাতিরিক্ত ভোগ-বিলাস। ফোর্টের ভিতরে দেখলাম সুবিশাল খিলানযুক্ত দেওয়ান-ই-আম ও দেওয়ান-ই-খাস। ফোর্টের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া খরস্রোতা যমুনার ওপারে দেখলাম নয়নাভিরাম তাজমহলের অপরূপ দৃশ্য। ফোর্টের খিলানে হেলান দিয়ে যমুনার দৃশ্য ও তাজমহলকে দেখা সত্যিই এক রোমাঞ্চকর ব্যাপার।

এরপর আমরা আগ্রা পার্কের দৃশ্য উপভোগ করার পর তাজমহলের কাছে গেলাম। তাজমহলের বিশালতা ও ভেতরের সুদৃশ্য মনোরম পরিবেশ দেখে সত্যিই মনে হয়েছিল যেন আমরা কোন এক স্বপ্নের জগতে এসেছি। কথিত আছে যে তাজমহল তৈরিতে বিশ হাজার লোকের বাইশ বছর সময় লেগেছিল। তাজমহলের বিশালতা ও কারুকার্য দেখে মনে হয়েছে আসলেই কথাটি সত্যি। মুঘল সম্রাট শাহজাহান তার স্ত্রী মমতাজের প্রতি অমর প্রেমের নিদর্শণস্বরূপ তৈরি করেছিলেন এই সমাধি সৌধটি। তাজমহলের প্রতিটি অংশে মূল্যবান পাথর ও কারুকার্য দেখে খুবই অবাক হলাম। যাই হোক পরের দিন আমরা রওয়ানা হলাম জয়পুরের উদ্দেশ্যে। জয়পুরে গ্রীণ সিটি, পিংক সিটি, জয়পুর মিউজিয়াম, আম্বর প্যালেস, ওয়াটার গার্ডেন ও অন্যান্য দর্শনীয় স্থানগুলো আমরা একে একে উপভোগ করলাম। জয়পুর মিউজিয়ামে আমরা প্রায় সারে তিন হাজার বছর পূর্বের মমি দেখে অভিভূত হলাম। গ্রীন সিটিতে দেখলাম সবকিছুই সবুজ বর্ণের এবং পিন্ক সিটিতে দেখা মিলল গোলাপী বর্ণের সমারোহ। সুবিশাল লেকের মধ্যে ওয়াটার গার্ডেনের অপরূপ সৌন্দর্য ভুলবার মতো নয়। তাছাড়া সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় হাজার বছরের পুরনো রাজবাড়ি তথা আম্বর প্যালেস মনের মধ্যে এখনও শিহরণ জাগায়। জয়পুরে সবকিছু দেখার পর আমরা রওয়ানা করেছিলাম আজমীর শরীফের উদ্দেশ্যে।

সুবিশাল মরুভূমির দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আমরা ১২ ঘন্টা পর পৌঁছলাম আজমীর এ। হোটেলে উঠে বাথরুমে ঢুকে পরলাম এক বিপত্তিতে। এখানেও আগ্রার মতো পানি প্রচণ্ড রকমের খর। সাবান দিয়ে কাপড় কাচতে গিয়ে পড়েছিলাম বিপত্তিতে। গায়ে মাখা সাবানের স্থায়িত্ব শরীরে বেশ কিছু দিন টের পেয়েছিলাম। যাইহোক আজমীর শরীফের ভিতরে ঢুকে দেখলাম অন্যরকম একজগৎ। সেখানে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষের মিলন মেলা। সবাই মনোবাসনা পূর্ণের আশায় আসে এখানে। তাবিজ-তুমার, লাল-নীল সুতা ঝিনুক-কড়ি, রকমারি সুগন্ধি ও বিভিন্ন রকমের পাথরের রমরমা ব্যবসার কেন্দ্রবিন্দু বলে মনে হয়েছিল আজমীর কে। মাঝারে ঢুকার ১ম গেটের পর ২য় গেটের দু পশে দেখলাম বিশাল আকৃতির ২টি কাসার পাতিলে মানুষ লাইন ধরে দু'হাতে টাকা পয়সা ও সোনা-দানা অবিরাম ছুড়ে ফেলছে। ভিতরে ঢুকার পর আমার অজান্তেই কে যেন এসে হাতে লাল সুতা পড়িয়ে দিল এবং বিনিময় মূল্য দাবি করে বসল। স্থানে-স্থানে নারী পুরুষ দলে দলে গোল হয়ে বসে গান বাদ্য করছেন। দেখা মিললো লোকজন দলে দলে ডালা ভর্তি বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে মাথায় করে মাঝারের চারদিকে প্রদক্ষিণ করছেন। আমরাও শত-শত মানুষের ধাক্কায় কখন যে ভিতরে ঢুকে গেলাম তা টেরই পেলাম না। হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি (র:) এর মাঝারের পাশের কালো পাহাড়ে প্রচণ্ড গরমে অনেক কষ্টে উপড়ে উঠে পেয়েছিলাম ঠাণ্ডা বাতাসের প্রশান্তি। পাহাড়ের গাঁয়ে বাকে-বাকে আছে পূরনো শত-শত কবর। পাহাড়ের চূড়া থেকে পুরো আজমীর শহরকে দেখতে খুবই মনোমুগ্ধকর ও উপভোগ্য মনে হয়েছিল। ভারতবর্ষে এখনও মানুষ কত যে কুসংস্কার-এর মধ্যে আছে তা ভারতে না গেলে বুঝতামনা।

আজমীর ভ্রমণের পর আমরা রওয়ানা হয়েছিলাম দিল্লির উদ্দ্যেশ্যে। দিল্লিতে প্রায় ২২টির মতো দর্শনীয় স্পট দেখেছিলাম আমরা। আমরা পার্লামেন্ট হাউজ, দিল্লি গেট, দিল্লি পার্ক, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, যন্তর-মন্তর, লালকেল্লা, দিল্লি মসজিদ, রাজঘাট (গান্ধীর সমাধি), কুতুব মিনার, লোটাস টেম্পল, সেন্ট্রাল ট্রেম্পল, ইন্দিরা গান্ধীর বাড়ি ও অন্যান্য দর্শণীয় স্থানসমূহ উপভোগ করলাম। ইন্দিরা গান্ধির বাড়িতে যে মিউজিয়াম রয়েছে তা দেখে সত্যিই অবিভূত হয়েছি। তিনি বঙ্গবন্ধুর মতো সাধারণ লাইফ লিড করতেন। তিনি মানুষকে সহজেই বিশ্বাস করতেন, ভালবাসতেন এবং মানুষের সাথে সহজেই মিশতেন। যার দরুণ বঙ্গবন্ধুর মতো তারও করুণ পরিনতি হয়েছিল। নিজ বাড়িতেই দেহ রক্ষীর হাতে গুলিবিদ্ধ হন তিনি। দিল্লিতে পাতাল ট্রেনে করে আমরা ঘুরে বেড়িয়েছিলাম পুরো শহর।

দিল্লির পর আমরা গিয়েছিলাম শিলিগুড়ি হয়ে বিশ্বের অন্যতম স্বাস্থ্যকর ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধার দার্জিলিং এ। দিল্লিতে যেখানে তাপমাত্রা ছিল ৪০-৪৫ ডিগ্রি সেখানে পরের দিন দার্জিলিং-এ এসে তাপমাত্রা পেলাম ০-১০ ডিগ্রির মতো। তাই শিলিগুড়ি নেমে শাল কিনে নিলাম প্রথমে। ছোট জিপে করে পাহাড়ি আঁকাবাঁকা কার্পেটিং করা রাস্তা দিয়ে প্রায় আড়াই থেকে তিন ঘন্টায় পৌঁছলাম স্বপ্নের সেই দার্জিলিংয়ে। জিপ যখন ৬০ ডিগ্রি কোণে উপড়ে উঠে আবার নামে এবং ৯০ কোণে পাহাড়ী পথে বাঁক নেয় তখন কলিজার পানি শুকিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। তারপরও আমি বলবো প্রচণ্ড উপভোগ্য ব্যাপার ছিল সেই ভ্রমণ।

পাহাড়ী পথে মোড়ে মোড়ে প্রচুর জলপ্রপাত ও ঝড়ণাধারার শব্দ যেন আজো আমার কানে এসে দোলা দেয়। সন্ধ্যা লগ্নে হোটেলে উঠে লেপমুড়ি দিয়ে থাকা ছিল খুবই উপভোগ্য বিষয়। পরদিন সকালে ভোরে ঘুম থেকে উঠে কাঞ্চনজঙ্ঘগা দেখা ছিল অন্য রকম এক রোমান্ঞ্চকর ব্যাপার। আমরা টাইগার হিল, গঙ্গামায়া, চা বাগান ও অন্যান্য স্পটগুলো উপভোগ করেছি। তাছাড়া দার্জিলিং এ মার্কেট ভ্রমণ ছিল খুবই উপভোগ্য বিষয়। সেখানে চাইনিজ পণ্যে মার্কেট প্রায় সয়লাব। তাছাড়া গুর্খাদের তৈরি হোম মেড জিনিসও অনেক রয়েছে সেখানে। দিনের মতো রাতের দার্জিলিং ও অনেক সুন্দর। পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে মার্কেট, কাঠের ও ইট পাথরের দালান বাড়ির আলোর ঝলকানীও রাশি-রাশি মেঘমালার সংমিশ্রণে এক অন্যরকম অনুভূতি জেগে ছিল মনে। সুউচ্চ পাহাড়ে রাশি-রাশি মেঘমালা হাত দিয়ে স্পর্শ করার রোমান্ঞ্চ কখনো ভূলবার মতো নয়।

মানুষকে মহান আল্লাহ পাক কত কৃপায় বাচিয়ে রেখেছেন এবং পৃথিবী যে এতো সুন্দর তা দেশ ভ্রমণ না করলে বুঝা সম্ভবপর নয়। ব্রিটিশরা দার্জিলিংয়ে অনেক কিছু গড়ে দিয়ে গেছে। পাহাড়ের এতো চূড়ায় মানুষ যে শত-শত বছর যাবৎ কিভাবে বাস করছে তা স্ব-চক্ষে না দেখলে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হবেনা। দার্জিলিং এ গিয়ে টয় ট্রেনে চড়া ছিল অন্যরকম এক রোমাঞ্চ। দার্জিলিং টিকে রয়েছে মূলত দুটি জিনিসের কারণে। এক হলো পর্যটন শিল্প ওদ্বিতীয় টি হলো প্রাকৃতি কসম্পদ। দার্জিলিং এ তিন দিনের ভ্রমণ শেষে আমরা আবার রওয়ানা হলাম সমতল ভূমির উদ্দেশ্যে। পাহাড়ের বাঁকে-বাঁকে সাদা মেঘের আনাগোনা মনে হতো যেন হাতছানী দিয়ে ডাকছে আমাদেরকে। গাড়ির গ্লাসের উপড় আছড়ে পরা চলমান সাদা মেঘমালার কোমল স্পর্শ এবং পাহাড়ি পথের বাঁকে বিভিন্ন ফল বাগানে কাঠবিড়ালের ফল খাওয়ার দৃশ্য সত্যি ভুলবার মতো নয়। শিলিগুড়ি এসে বিকেলের নাস্তা সেরে কোলকাতা যাওয়ার জন্যে বাসের টিকেট কাটলাম। পুরো পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে রাতভর ভ্রমণ শেষে সকাল ১০টার দিকে কোলকাতায় এসে পৌঁছলাম আমরা। কোলকাতার সকল দর্শণীয় স্থানসমূহ পরিদর্শণ শেষে পরের দিন আল্লাহর অশেষ রহমতে সুস্থ শরীরে প্রিয় বাংলার বুকে মায়ের কোলে ফিরে আসলাম আমরা।

শেষ কথা: বিদেশ ভ্রমণ সত্যিই একরাশ আনন্দ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যম বলে আমি মনে করি। এতে একদিকে যেমন পরিশ্রম তবে অন্যদিকে নতুন দেশে নতুন-নতুন বিষয়ের সাথে পরিচিত হওয়ার প্রচুর সুযোগও থাকে। মুসলিম শাসকদের হাজারো নিদর্শনের দেখা মিলবে গোটা ভারতে। ভারতে এখনও অনেক কুসংস্কার বিরাজমান। ভারতীয়রা মিতব্যয়ী। তারা অনেকাংশেই কৃপণ। তারা খুবই রক্ষণশীল। তবে রাস্তার ড্রাইভার থেকে শুরু করে আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা মোটামুটি সকলেই ইংরেজিতে ভাল বলতে পারে। রেল যোগাযোগে অনেক উন্নত তারা। তবে তাদের মধ্যে স্বদেশ প্রেম আছে। তারা আইনকে খুবই শ্রদ্ধা করে। তাদের দেশে দীর্ঘ এক মাসে প্রকাশ্যে কোন ধূমপান চোখে পড়েনি। অনেক প্রদেশে আড়ালে পাতার বিড়ি খেতে দেখেছি। তারা কর্মঠ, খুবই স্মাট ও করিৎকর্মা। মার্কেটে সতর্ক থাকতে হয় সবসময়। সুযোগ পেলে তারা কাস্টমার ঠকানোর ওস্তাদ বটে। ট্রেন ভ্রমণে পদে পদে হিজড়াদের জ্বালাতন ভুলবার মতো নয়। রেল যোগাযোগে ভারত অনেক উন্নত। কোলকাতা এবং দিল্লিতে পাতাল ট্রেন ভ্রমণের আনন্দও ভুলবার মতো নয়। তবে ট্রেনে করে কোলকাতা থেকে আগ্রা যাবার পথে আমাদের বন্ধু টিটু ও ফাতেহার লাগেজ চুরির দূর্ঘটনাটি আমার মনে এখনও নাড়া দেয়। দীর্ঘ এক যুগ পর তাদেরকে আমি আবারও সমবেদনা জানাচ্ছি। বাস্তবিক পক্ষে আমাদের দেশও সৌন্দর্যের দিক দিয়ে ভারতের চেয়ে কম নয়। আমাদের মতো সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা উর্বর মাটি ভারতে নেই। আমাদের উন্নয়নে জন্যে যেটা দরকার তা হলো আমাদের দেশপ্রেম, স্বদিচ্ছা, সৎ চিন্তা, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও মানসিকতার পরিবর্তন। আমাদের দেশের মানুষ পরিশ্রম না করে সহজে কোন কিছু পেতে চায়। আসলে পরিশ্রমই হলো সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।

পরিশেষে আমি বলতে চাই মানুষ মরে যায় কিন্তু জীবনের প্রতি বাঁকে-বাঁকে ঘটে যাওয়া স্মৃতিগুলো চিরদিন বেঁচে থাকে ইতিহাস হয়ে। আমার লিখার তেমন অভ্যাস বা অভিজ্ঞতা নেই। তাই আজ যেটুকুন লিখার চেষ্টা করলাম তা কেবলই মনের আবেগের বহি:প্রকাশ মাত্র।

লেখক: মনিটরিং অফিসার ও সহকারী অধ্যাপক (কৃষিবিজ্ঞান), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ভারত যেমন দেখে এলাম

দীপংকর বর

মুম্বাই এর জুহু সমুদ্র সৈকত থেকে আরব সাগরে সূর্যাস্তের অপার্থিব দৃশ্য অবলোকনের পর বান্দ্রা টার্মিনাসের দিকে যাচ্ছিলাম। কিছুদুর যেতেই দেখা গেল হাজারো মানুষের হট্টগোল। রাস্তার দুপাশ এবং মাঝখানে দাঁড়িয়ে সবাই একদিকে কি যেন দেখছে। প্রথমে মনে হলো সড়ক দুর্ঘটনা বা ঐজাতীয় কিছু। কিন্তু মেলাতে পারছিলাম না। হঠাৎ ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলাম কি ব্যাপার। মারাঠী ভাষায় তার উত্তরে একটু শব্দ বুঝলাম-'জলসা'। জলসা মানে তো আড্ডা। তো আড্ডা কি রাস্তার উপর! তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেলো। এ জলসা তো সে জলসা নয়। বলিউডের শাহেনশাহ অমিতাভ বচ্চন, তার বাঙালি জায়া জয়া, পুত্র অভিষেক, পুত্রবধু বিশ্বসুন্দরী ঐশ্বর্য রাইদের বাসগৃহ 'জলসা'। তাদের এক পলক দেখার জন্যই এই হই হট্টগোল। অসংখ্য মানুষ। এই কিছুক্ষণ পর বেরোবে, এই এখনই বের হবে শব্দ কানে আসে আর সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তাদের যমদূতের মতো দক্ষিণ ভারতীয় ব্যক্তিগত দেহরক্ষীর দল অপেক্ষারত মানুষদের জন্তু জানোয়ারের মতো তাড়ানোর পরেও একটু দেখার জন্য সবাই বারে বারে গেটের কাছে চলে যায়। সময়ের ব্যস্ততার কারণে আমি অমিতাভদের না দেখে বরং তাদের এক পলক দেখার জন্য মানুষের আকুতি দেখে সেখান থেকে সরাসরি চলতে আরম্ভ করলাম গেলাম বান্দ্রা টার্মিনাসের দিকে। আর ভাবতে থাকলাম প্রথম জীবনে অখ্যাত 'ইনকিলাব শ্রীবাস্তব' তার অধ্যবসায় ও নিষ্ঠায় কিভাবে পরিনত হলেন বলিউড শাহেনশাহ অমিতাভ বচ্চনে যিনি এখন শুধু ভারতবর্ষ নয় সারা পৃথিবীর চলচ্চিত্রপ্রেমী মানুষের কাছে অতিপরিচিত নাম।

এর পূর্বে সকালে পাশ্চাত্য শিল্পে কারুকার্যময় মুম্বাই ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ রেল স্টেশন, ভারতবর্ষ থেকে শেষ ব্রিটিশ সৈন্যের প্রস্থানপথ গেটওয়ে অভ ইন্ডিয়া, গুহাচিত্রের দ্বীপ এলিফ্যান্টা, দাদা সাহেব ফালকে স্টুডিওসহ মুম্বাই এর প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থান পরিভ্রমণ শেষে ক্লান্ত শরীরে বান্দ্রা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ওয়েটিংরুমে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই। পরদিন ভোররাতে রওয়ানা হলাম আজমীর শরীফ এর উদ্দেশ্যে। পথে কিছুসময় কাটালাম মাধেপুর স্টেশনে যেখানে দেখলাম বিখ্যাত রণথম্বর দুর্গ ও অভয়ারণ্য। চলন্ত ট্রেনের কামরার ভিতর থেকে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থানের ভূভাগের অপূর্ব দৃশ্য, প্রবহমান নর্মদা নদীর স্বচ্ছ জলধারা, বিভিন্ন ফসলের ক্ষেত দেখার পাশাপাশি মনে পড়তে লাগলো গত চার মাসের ভারত ভ্রমণের স্মরণীয় মুহূর্তগুলো।

১ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রি.। রাত ১১ টা। হাড় কাঁপানো শীত। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট এ নামলাম। ঐতিহাসিক দিল্লি। ভারতের রাজধানী। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক অংশীদারিত্ব রয়েছে যে দেশের সাথে, সেই প্রতিবেশী দেশটি দেখা হয়নি কখনো। এখানে আসার পর জানতে পারলাম, যমুনা নদীর তীরে বিভিন্ন রাজবংশ বিভিন্ন সময়ে রাজধানী হিসেবে প্রায় একই জায়গায় বিভিন্ন নগরীর পত্তন করেছিলেন। এরকম দশটি রাজধানীর অস্তিত্ব এখনো আছে। এখন সব মিলিয়ে এক নামে আমরা জানি দিল্লি। দৃষ্টিনন্দন লালকেল্লা, পুরানা কেল্লা, জ্যোতির্বিদ্যাকেন্দ্র জন্তর মন্তর, দৃষ্টিনন্দন লোটাস টেম্পল, ইসকন টেম্পল, সম্রাট হুমায়ুনের সমাধি, সফদরজং সমাধি, রাজঘাট, শক্তিস্থল, জনপথ, রাষ্ট্রপতি ভবন, তিন মুর্তি ভবন, ইন্দিরা গান্ধী ভবন, চিড়িয়াখানা, জাতীয় জাদুঘর সব ঘুরে দেখার পরে চোখের সামনে অনাবৃত হলো ভারতীয় উপমহাদেশের সুদীর্ঘকালের ইতিহাস। দিল্লির বিখ্যাত মার্কেট নেহরু প্লেস এবং কেন্দ্রস্থল কোনাট প্লেস, সুলভে ছোট বড় সব ধরণের কেনাকাটার জন্য দিল্লির বিখ্যাত স্থান সরোজিনীনগর মার্কেট ঘুরে দেখলাম অনেকবার। গর্বের বিষয় মুন্সীগঞ্জের মেয়ে বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী সরোজিনী চট্টোপাধ্যায় স্বাধীন ভারতে উত্তর প্রদেশের প্রথম গভর্নর ছিলেন যার নামে সরোজিনী মার্কেটের নামকরণ। ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে একজন বাংলাদেশী হিসেবে বক্তব্য দেওয়ার এবং দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশন আয়োজিত পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে যোগদান ছিল এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

ভারতের ট্যুরিজম ট্রায়াঙ্গেল দিল্লি-আগ্রা-জয়পুর সফরে বের হয়েছিলাম অনেক উচ্ছাস নিয়ে। প্রথমে আগ্রায় সম্রাট শাহজাহানের প্রিয়তমা স্ত্রীর সমাধির উপর নির্মিত জগদ্বিখ্যাত তাজমহল, মোগল সম্রাটদের রাজভবন আগ্রা ফোর্ট, সেকেন্দ্রায় সম্রাট আকবরের সমাধি এবং সবশেষে আকবরের রাজধানী ফতেহপুর সিক্রি পরিদর্শন করলাম। আগ্রা পরিভ্রমণের পরে রওয়ানা হলাম বীর মহারানা রাজপুতদের মরুরাজ্য রাজস্থানের দিকে। রাজস্থানের পর্বতোপরি সম্রাট আকবরের সেনাপতি রাজা মানসিংহ এর অপূর্ব সৃষ্টি অম্বর ফোর্ট, জয়পুরের মহারাজাদের সিটি প্যালেস, জোতির্বিদ্যা কেন্দ্র জন্তর মন্তর, হাওয়া মহল, জলমহাল প্যালেস,

আলবার্ট হল জাদুঘর ঘুরে দেখার পরে মহারাাদেও অতীত শৌর্যবীর্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেলো। জয়পুর থেকে ফেরার পথে আরাবল্লী পর্বতমালার উপর বিভিন্ন ধরণের দুর্গ ও সুউচ্চ পর্বতশীর্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভগ্ন প্রাচীন প্রাসাদের দৃশ্য সেই রাজপুত রাণাদের কালে নিয়ে গেল।

কোনো এক শীতের সকালে ঘুরে এসছিলাম উত্তর প্রদেশে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান মথুরা, লীলাস্থল বৃন্দাবন এর দিকে। রাধাকৃষ্ণের স্বর্গীয় প্রেমের স্মৃতি বিজড়িত যমুনার বিশ্রাম ঘাটে গিয়ে মনে হলো আমি তাদের সময়ে চলে গিয়েছি। পাঞ্জাবের অমৃতসরে অবস্থিত চোখ ধাঁধানো স্বর্ণমন্দির এবং তার নিখুত ব্যবস্থাপনা দেখে অবাক হলাম। সেখানে প্রতিদিন এক লক্ষের বেশি লোককে বিনা পয়সায় খাওয়ানো হয় অসামান্য দক্ষতায়। ঐতিহাসিক জালিয়ানওয়ালাবাগ মেমোরিয়াল জাদুঘর, ভারত-পাকিস্তানের বিখ্যাত বাঘা বর্ডার, ক্যান্টনমেন্ট নগরী জলন্ধর, লুধিয়ানা ভ্রমণ না করলে পাঞ্জাবের আসল রূপ দেখা হতো না। পরদিন গেলাম জম্মু। সেখানকার পর্যটন শহর কাটরায় অবস্থিত ১৪ কিমি পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে বৈষ্ণদেবীর মন্দির, তিন হাজার বছরের পুরানো বাহু ফোর্ট, কাশ্মীরের মহারাজাদের প্রাসাদ অমর মহলসহ অনেক ঐতিহাসিক স্থাপনা দর্শনে অন্য জগতে ফিরে গেলাম। মহাভারতের যুদ্ধক্ষেত্র হরিয়ানা প্রদেশের কুরুক্ষেত্র এবং উত্তরাখণ্ড প্রদেশে গঙ্গা নদীর সমতলে আগমনের ক্ষেত্র বিখ্যাত হরদ্বার, শৈলশহর ঋষিকেশ ভ্রমণ না করলে ভারত ভ্রমণ অনিবার্যভাবে অসম্পূর্ণ থাকতো। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে অনেক মুক্তিযোদ্ধা সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন উত্তরাখণ্ডের রাজধানী দেরাদুন এ। দেরাদুনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য স্মৃতিতে অমলিন থাকবে আজীবন। হিমালয়ের সৌন্দর্য অবলোকনের জন্য গেলাম অনন্য পাহাড়ি হ্রদের শহর নৈনিতাল এবং নন্দাদেবী পর্বতশৃঙ্গের নিকট অবস্থিত গর্বিত হিমালয় কন্যা কৌসানিতে। এখানে মহাত্মা গান্ধী জীবনের কিছুকাল কাটিয়েছিলেন এবং অনাশক্তি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

কোনো এক রাতে দিল্লি রেলস্টেশন থেকে ট্রেনে করে রওয়ানা হলাম পশ্চিমবঙ্গের বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্যে। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদী মিলনস্থল ত্রিবেনীসঙ্গম এলাহাবাদ (প্রয়াগরাজ), মন্দিরের নগরী বারানসী (কাশী), বৌদ্ধধর্ম প্রচারের প্রথম স্থান সারনাথ পরিভ্রমণ স্মৃতিতে স্মরণীয় হয়ে থাকবে অনেককাল। বিহারের গয়া, মহামতি গৌতমবুদ্ধের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির স্থান বুদ্ধগয়া, জলহীন ফল্গু নদী অনেক দিনের ইচ্ছাপূরণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বর্ধমান এবং সবশেষে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আদিবাসীদের নৃত্য রবি ঠাকুরের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল।

মধ্যপ্রদেশের ভূপাল, বিদিশা, দুর্গনগরী গোয়ালিয়র, ঝাঁসি পার হয়ে বিন্ধ্য পর্বত, সাতপুরা পর্বতশ্রেণি ও নর্মদা নদীর অববাহিকায় সাধারণ মানুষদের সাথে কয়েকদিন অবস্থান করে সেখানকার রুক্ষ পরিবেশ ও মানুয়ের সংগ্রামী জীবন প্রত্যক্ষ না করলে ভারত আত্মার সন্ধান অসম্পূর্ণ থাকত নিঃসন্দেহে। গুহাচিত্র ও ভাস্কর্যের জন্য বিখ্যাত মহারাষ্ট্রের অজন্তা, ইলোরা ও পর্যটন রাজধানী আওরঙ্গবাদ পরিদর্শন না করলে প্রাচীন ভারতের অবিশ্বাস্য শিল্পকলা ও ইতিহাসের সাক্ষী হতে পারতাম না।

আজমীরে অবস্থিত গরীবে নেওয়াজ খাজা মাঈনুদ্দিন চিশতী(রাঃ) এর মাজার, দিল্লির হযরত নিজামউদ্দীন আউলিয়ার(রা:) মাজার; দিল্লির জামে মসজিদ, এবং হিন্দু ধর্মের তীর্থস্থান গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, পুস্কর, বৌদ্ধ ধর্মের তীর্থ সারনাথ, বুদ্ধগয়া, বিভিন্ন স্থানের দিগম্বর জৈন মন্দির এবং বিভিন্ন জায়গার শিখদের গুরুদুয়ারা পরিদর্শন ছিল অনন্য অভিজ্ঞতা।

ভারতের রাজস্থানে দেখেছি ধুধু বালুর মরুভূমি, আবার উত্তরাখণ্ড ও জম্মুতে দেখেছি বরফশীর্ষ আকাশভেদী পর্বতমালা। মধ্যপ্রদেশে দেখেছি দুর্ভেদ্য জঙ্গল আবার উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ সবুজ সমতল। বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, বিভিন্ন রকমের খাবার, কৃষ্টি কালচার সমৃদ্ধ ভারত। উত্তরাঞ্চলে ছিল প্রচণ্ড শীত আবার মধ্যাংশে ছিল দম বের করা গরম। কোথাও দেখেছি সীমাহীন দারিদ্র, আবার কোথাও ধনের প্রাচুর্য। সমগ্র ভারত ভ্রমণ করলে মিনি দুনিয়া ভ্রমণ হয়ে যায়। ভারত ভ্রমণের অংশ হিসেবে আগ্রায় সম্রাট শাহজাহান ও সম্রাজ্ঞী মমতাজের সমাধি তাজমহল, দিল্লির হুমায়ুনের সমাধি, লোদি গার্ডেনে লোদি সম্রাটদের সমাধি, তুঘলকাবাদে তুঘলকদের সমাধি, মেহেরুলীতে সুলতানদের সমাধি, সেকেন্দ্রায় মহামতি আকবরের সমাধি, আওরঙ্গাবাদে আওরঙ্গজেবের সমাধি, দিল্লির রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধী, জওয়াহারলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধীসহ ভারতের প্রায় সকল প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর সমাধি দর্শনে এই শিক্ষাই পেয়েছিলাম যে আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবন কালের গর্ভে বিলীন হয়, বস্তুগত অস্তিত্ব হিসেবে রয়ে যায় তার সমাধি। কিন্তু লোকের হৃদয়ে রয়ে যায় তার মহিমা, তার কর্ম। আমরা যদি ক্ষুদ্র এ জীবন জনহিতে ব্যয় করতে পারি তবেই হবে এ জীবনের সার্থকতা।

ভারত সরকারের অর্থায়নে ৪টি মহাদেশের ১৬ টি দেশের ২৪ জন উন্নয়নকর্মীর অংশগ্রহণে 'ডিসকাভারি অভ ইন্ডিয়া' মডিউলের অংশ হিসেবে ভারত আত্মার সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণের পর অভিজ্ঞতার ওপর পরীক্ষা নেয়া হয়। সৌভাগ্যবশত: সকলের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করি এবং ভারতের কেন্দ্রীয় তথ্য, সম্প্রচার ও টেক্সটাইল মন্ত্রী শ্রীমতি স্মৃতি ইরানী আমাকে সম্মানজনক 'প্রেস ট্রাস্ট অভ ইন্ডিয়া' উপাধিতে ভূষিত করে বিশেষ সনদপত্র ও প্রণোদনা পুরস্কার প্রদান করেন। ফলে এই অনন্য সুযোগে, আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির অংশীদার বন্ধুপ্রতিম দেশ ভারতের উত্তরে জম্মু থেকে দক্ষিণে মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ এবং পশ্চিমে পাঞ্জাব, রাজস্থান থেকে পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ এর মধ্যে সকল বিখ্যাত ধর্মীয়, ঐতিহাসিক, পুরাতাত্ত্বিক ও বিভিন্ন রাজবংশের স্থাপনাসমূহ না দেখলে উপমহাদেশের অতীত ঐতিহ্যের অনেক কিছুই অদেখা ও অজানা থাকত।

লেখক: সিনিয়র তথ্য অফিসার, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

কার্বন নির্গমনের ভবিষ্যৎ

* মোহাম্মদ শাহ আলম

পৃথিবীপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, বায়ুমণ্ডল গঠনকারী গ্রিন হাউজ গ্যাসসমূহ না থাকলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ১৮ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সূর্য থেকে আগত বিকিরণ ও পৃথিবী থেকে নির্গত রশ্মির সাথে গ্রীন হাউজ গ্যাস সমূহের মিথস্ক্রিয়ার কারনে ধরণীর বুকে আমাদের বেঁচে থাকা সম্ভব হয়েছে। এই মিথস্ক্রিয়া গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়া নামে পরিচিত। (চিত্র- ১)। পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে এটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হলেও শিল্প বিপ্লবের পর থেকে এটি একটি Negative Connotation হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে জীবাশ্ব জ্বালানির ব্যাপক ব্যবহার, অতি নগরায়ন, বন উজাড় প্রভৃত কারণে বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন হার বেশ বেড়েছে যা বিস্ময়কর। প্রাক শিল্প বিপ্লবের সময়কাল থেকে অদ্যাবধি CO_2 বেড়েছে ৪০%, CH_4 বেড়েছে ১৫০%, N_2O বেড়েছে ২০%, যার কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা ১৯০০ সাল থেকে গড়ে বেড়েছে ০.৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। (চিত্র-২), তবে এই গ্যাসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো কার্বন ডাই-অক্সাইড কারণ হলো কার্বন ডাই-অক্সাইড একসাথে Radiative Forcing ও Climate Feedback হিসেবে কাজ করে। Radiative Forcing এর কাজ হলো বায়ুমণ্ডলীয় বিকিরণ শোষণ করে তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া, অন্যদিকে Climate Feedback কাজ হলো অন্যান্য Radiative Forcing গুলোর সাথে বিক্রিয়া পূর্বক পুনঃপুনিক প্রক্রিয়ায় ওই তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেওয়ার হারকে ত্বরান্বিত করা।

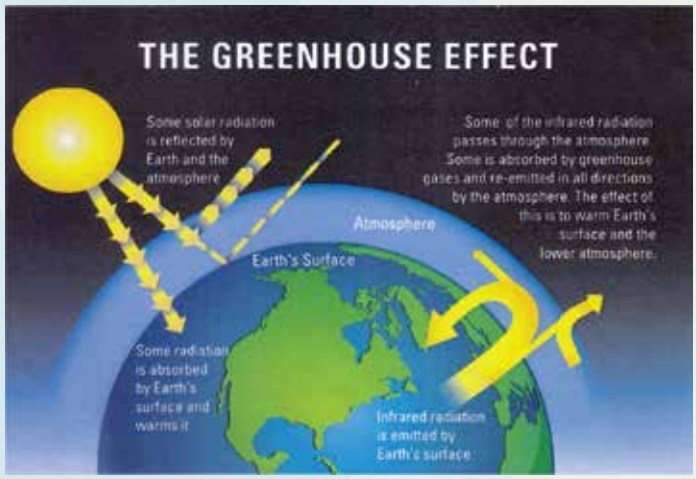

চিত্র-১ গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়া

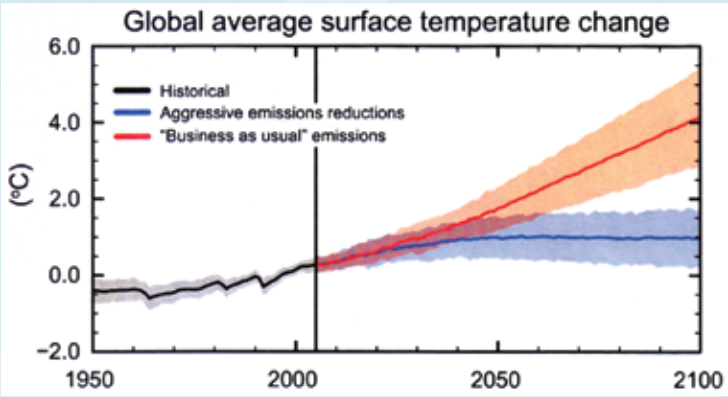

চিত্র-২ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির চিত্র

পর্যবেক্ষণকৃত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ১৯৫৯ সালে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমনের হার ছিল ৩১৬ PPM। যেখানে ২০১৩ সালে ছিল ৩৯৬ পিপিএম। অথচ Ice Core Data বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বিগত ১০০,০০০ বছরের জন্য কার্বন নির্গমণের পরিমাণ ছিলো ২৬০ -২৮০ PPM এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। ৩-৫ লক্ষ মিলিয়ন বছর পূর্বে ছিল ৪০০ PPM ৫০ মিলিয়ন বছর পূর্বে এ হার ছিল ১০০০ পিপিএম। সেই সময় পৃথিবীর তাপমাত্রা ছিলো বর্তমান সময়ের ১০ গুণ বেশি এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ছিল প্রায় ৬০ ফুট। (চিত্র -৩), তাহলে দেখা যাচ্ছে ভূতাত্ত্বিক সময়পুঞ্জির সুদূর অতীতে পৃথিবীর তাপমাত্রা ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বর্তমান সময়ের তুলনায় বেশি ছিলো। কিন্তু এটি ছিলো পুরোপুরি প্রাকৃতিক ঘটনা যা মিলিয়ন বছর সাইকেলে সূর্য থেকে সৌরঝড়ের কারণে অতিরিক্ত তাপ বিকিরণ। কিন্তু বর্তমান সময়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমনের কারণ পুরোপুরি মানব সৃষ্ট এবং ১৯৭০ সালের পর থেকে এই নির্গমনের হার আশঙ্কাজনক। পূর্বের কার্বন ডাই-অক্সাইড শুধুমাত্র Radiative Forcing হিসেবে কাজ করত। বর্তমান Radiative Forcing এবং Climate Feedback দুইভাবেই Climate System-এ প্রভাব বিস্তার করছে।

কার্বন ডাই-অক্সাইড স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডল উদ্ভিদ, প্রাণী এবং জীবের মৃতদেহ বিশ্লেষণের পর পুনরায় বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। শিল্প বিপ্লবের পূর্বে এটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া থাকলেও শিল্প বিপ্লবের পর অতিরিক্ত কার্বন নির্গমনের কারণে কার্বন চক্রের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যহত হয়, কারণ জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে উদ্ভূত কার্বন আইসোটপ কার্বন সাইকেলে সম্পূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করতে পারে না। যার ফলে বায়ুমণ্ডলে ব্যাপকহারে কার্বন ডাই-অক্সাইড সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চিত কার্বনের পরিমাণ এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে কার্বন ডাই-অক্সাইড Radiative Forcing, Climate Feedback ধর্মের কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়তেই থাকবে। আজকেও যদি তাপমাত্রা গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন বন্ধ করা হয় এর প্রভাব আগামী কয়েক হাজার বছর পর্যন্ত চলতে থাকবে। তাই বিশ্ব নেতারা পৃথিবীর তাপমাত্রা ১.২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সীমার মধ্যে রাখার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

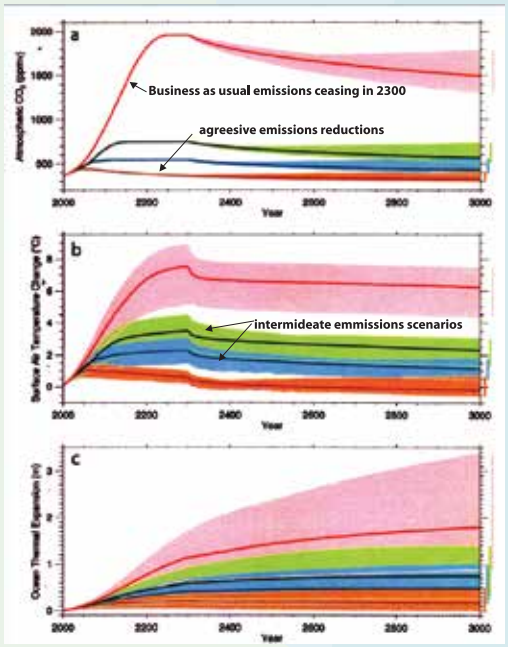

চিত্র-৪ ভবিষ্যৎ নির্গমন ও এর প্রভাব

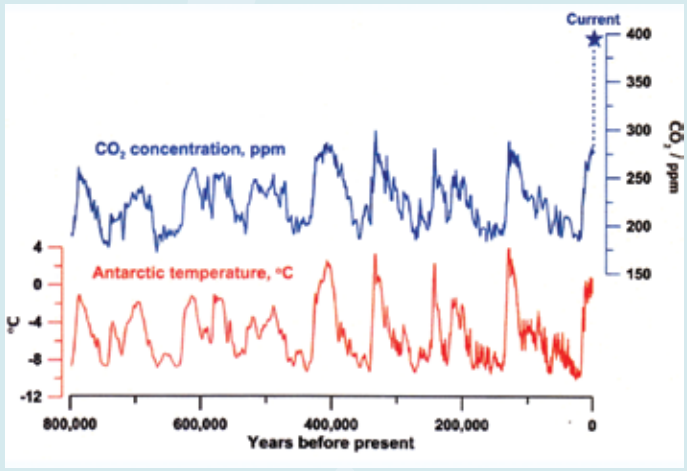

চিত্র- ৩ কার্বন নির্গমনের পরিমাণ

লেখক : সহকারী অধ্যাপক (ভূগোল), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাউশি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

আমার পৃথিবী

মোঃ কামরুল ইসলাম

একবার ভেবেছিলাম আমার পৃথিবীটা বিক্রি করে দেব সংগত মূল্যে।
সুষম ক্রেতা পাইনি বলে পৃথিবীটা আমার কাছেই রয়ে গেল।
ঠিক করেছিলাম অন্য একটা পৃথিবী কিনে নেব বাস্তব দামে।
এবারো হয়ে ওঠেনি।
কেন হয়ে উঠেনি, নাইবা বললাম।
শেষমেশ ঠিক করলাম ক্রয় বা বিক্রয় নয়, একটা সন্ধিতে যাব, যুতসই সন্ধি।
সন্ধিটা কাটার বিনিময়ে গোলাপের সন্ধি নয়।
এখানে বিনিময়ের বদলে ভালবাসা প্রাধান্য পাবে।
এবার আমি জিতে গেলাম। অন্য পক্ষও হারেনি।
এটাই বোধ হয় জীবনের নিয়ম।
এই সন্ধি শান্তির, এই সন্ধি ভালবাসার, এই সন্ধি উত্তাপের।

লেখক: অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, বাংলাদেশ পুলিশ

আটাশের পরিচয়

আবু সালেহ্ মুহাম্মদ নোমান

আটাশের বিজ্ঞপ্তি সে তো
বাইশ জানুয়ারি দু'হাজার আট সাল,
অবসান হলো দীর্ঘ প্রতীক্ষার
আড়াই বছরের অনাকাঙ্ক্ষিত মহাকাল।

আটাশের নিয়োগ গেজেট
সাল দু'হাজার দশ, পঁচিশ অক্টোবর,
এরই মাঝে শেষ হলো প্রিলি-লিখিত
মৌখিক আর চূড়ান্ত ফলাফল।

আটাশের প্রিলি মানে
আট মাত্রার ভূমিকম্পের শিহরণ,
আলোকিত সা'দত হুসাইনের মেধার প্রখরতা
নীলক্ষেত বিসিএসের বিয়োগান্ত নির্বাসন।

আটাশের লিখিত পরীক্ষা,
বিষয় বাংলাদেশ দ্বিতীয় পত্র,
এ যেন সংবিধানের অনুলিপি
উত্তরপত্রের প্রতিটি ছত্র।

আটাশের মৌখিক পরীক্ষা
সংকুচিত হয়ে নম্বর একশ হলো,
দুর্নীতি আর মনোবিদ
ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বদ্ধভূমিতে গেল।

আটাশ বিসিএস তুমি
শুভ পূর্বাহ্ন দু'হাজার দশ, এক ডিসেম্বার,
সুশাসন ও সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায়
প্রজাতন্ত্র পেল এক ঝাঁক মেধাবী অফিসার।

আটাশ মোরা হিরের টুকরো
প্রজাতন্ত্রের নির্ভেজাল সেবকের অঙ্গীকার,
আমরাই হব স্বাধীনতার প্লাটিনাম জুবিলিতে
উন্নত বাংলাদেশের রূপকার।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা

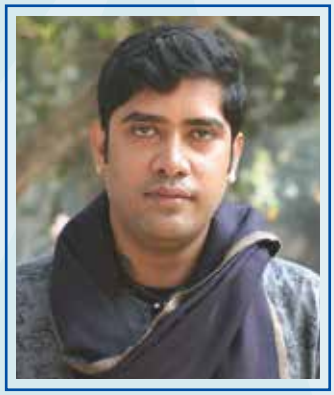

সভ্যতা

কুশল ভৌমিক

একটা সময় মানুষ নিজস্ব রমণীর জন্য
কিংবা পরের রমণী হরণের জন্য
ব্যক্তিগত অধিকার কিংবা সীমান্তের জন্য
যুদ্ধ করত।
সে বহু বহু যুগ আগের কথা।
মানুষ তখনো মানুষ হয়ে ওঠেনি
মানবিক সম্বোধনে মানুষ তখন দ্বিধান্বিত
দুর্যোধন কিংবা দুঃশাসন হয়ে তারা খুব সহজেই
বলতে পারতেন– 'বিনাযুদ্ধে নাহি দেব সূচাগ্র মেদিনী।'
তারপর–
রাতের গা থেকে ঝরে পড়লো অন্ধকার
পাথরে পাথর ঘষে কেবল আগুন নয়
তারা ছড়িয়ে দিল সভ্যতার দাবানল
ক্রমশ জয় করলো আকাশ ও হৃদয়ের ছায়াপথ
কালপুরুষ ও কৃষ্ণগহ্বর।
গহীন জঙ্গল থেকে গোলাপি গ্রহ মঙ্গলে
ছড়িয়ে দিল সভ্যতার বীজ
মহাকাশযান আর স্যাটেলাইটে তা মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ল
মহাবিশ্বের আনাচে-কানাচে
সমুদ্রের তলদেশে লুকিয়ে থাকা মুক্তোর দানা
দুর্গম পাহাড়ের গায়ে লেপ্টে থাকা হিরের খনি,
মহাজাগতিক উল্কাঝড়
নেপচুনের তুষারপাত, শনির রঙিন বলয়
তোমার-আমার শয্যাকক্ষের গোপন সংলাপ
কিছুই অজানা নয়
মানুষ এখন মানুষ হয়ে উঠেছে।

পৃথিবীতে কতো আলো; সভ্যতার দারুণ রোশনাই
অথচ মানুষ বেছে নেয় জন্মান্ধ উইপোকার জীবন
ঈর্ষা আর মাৎসর্যের তীব্র কোলাহল
সুর আর সুরা তাই রণভেরীতে একাকার
মানুষ এড়াতে পারে না
সপ্তর্ষিমণ্ডলের পাশে বিষধর সাপের ফণার মতো
প্রশ্নবোধক চিহ্ন।
ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মতো মানুষের রক্তে রাঙা হচ্ছে
ধূসর মৃত্তিকা, শ্বাপদের নখে লেগে আছে
মানুষের মাংস আর যুদ্ধবিমান তেড়ে যায়
সিরিয়ার দিকে, আর আমরা
প্রযুক্তির ইবলিস গুগলে দেখছি সাত আসমানের
জলরঙ এবং এভাবেই একদিন পৌঁছে যাব
নরকের সপ্তম গলিতে।

নির্জনতা, নিঃসঙ্গতা, কোলাহল, ব্যস্ততা– এইসব
সস্তা শব্দে ভরে আছে সভ্যতার সুনীল আকাশ
এখানে প্রেমে নেই ভালোবাসা; কেবল অস্থিরতা
কামনা মদির দুটি দেহের আহ্বান
অথচ মধুকর সেই কবে ডুবে গেছে কালিদহে
আহা! আহা সভ্যতা!
তোমার উঠান জুড়ে কেবল নিঃসঙ্গ ঝিঁঝিঁ পোকার
আত্মঘাতী আর্তচিৎকার–
আগামীর গন্তব্য তবে কোথায়?

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, নাগরপুর সরকারি কলেজ, টাঙ্গাইল

অনিন্দ্য আটাশ

মোঃ মোকছেদ হোসেন

সুন্দর পৃথিবীর
অনিন্দ্য পথচলা তুমি।
তুমি বিজয়ে গৌরবে
অমসৃণ এ সীমানায় রপ্ত গতি।।

জানো - একদিন এ গতির স্থবিরতায়
আটকে যাবে তুমি।
তোমার বিবর্ণ ক্ষণে চাহিবে বারে বারে
কোকিল ডাকা উদাস দুপুরে
কোন এক বসন্ত কুঞ্জ পানে।।

একদিন থাকবোনা মোরা কেউ
থাকবে শুধুই -
মোদের অকৃত্রিম কর্মের ঢেউ।
আর সেটিই হবো
আমি,
অজেয় দৃঢ় প্রত্যয়ে
অষ্টবিংশের সংহতি।।

এগিয়ে নিবো, এগিয়ে যাবো,
লাল-সবুজের শান্তির এ প্রিয়ভূমি-
গড়ে যাবো সকলের তরে
মানবতা আর ভালোবাসার চির অম্লান দীপশিখা জ্বালায়ে।

লেখক: উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান

আমি

জাহিদা বেগম

আমি কবি নই
চেনা পৃথিবীর চলমানতা খুঁজি কাব্যের শরীরে।
তাই ছন্নছাড়া শব্দরা হয় কবিতা
কখনো বোধে আসে
কেউবা ভুল বোঝে।
আজন্ম শৃঙ্খলিত আমি দুঃসাহসিক
মুক্তি খুঁজি বিক্ষিপ্ত শব্দরাজির মাঝে।

আমি কবি নই
বিবাগী কবিত্ব আমার সাধনা নয়,
জীবন সংসারের পাঁক ঘেটে
প্রতি পলে রসাস্বদনে
আমার আমিত্ব,
আমার জন্মসার্থকতা খুঁজে ফিরি।

প্রচন্ড ভীতু আমি কখনো কখনো
অমিয় সাহসে পাখা মেলি নীলিমায়,
কাব্যিক ভাবনারা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়,
পুরনো স্বপ্নেরা উড়ে যায়
দূরে বহুদুরে...
পাঁজরের ভাঁজে ভাঁজে বিন্দু বিন্দু হাহাকার
নেই কোন পরোয়া তার !

স্বপ্নবাজ আমি অদৃশ্য পঙ্খিরাজে
দেব পাড়ি এক মহাসমুদ্র নিত্য সাজে,
কুড়ায়ে মুক্তো গড়ব নতুন তাজমহল
তোরা যে যা বলিস বল।

আমি কবি নই
শব্দের সম্মোহনে স্বপ্নবাজ করি
স্বপ্নের ফেরি।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, নওগাঁ সরকারি কলেজ।

ফুলচুরি

এনামুল খান

তখন পড়ি হাইস্কুলে
উঠছি ক্লাশ সেভেনে,
ফুল ফুটত অনেক ভাল
নিতাই বাবুর ফুলবনে ।

ফুলগুলোকে করব চুরি
তৈরি হলাম তিনজনে,
নানান রকম পান করি
বসে বসে নির্জনে ।

রাত্র তখন একটা বাজে
ঘুট ঘুটে কি অন্ধকার !
সবাই তখন ঘুমিয়ে গেছে
সবার ঘরে বন্ধ দ্বার ।
রাত পোহালে একুশ তারিখ
ফুল দিব তাই মিনারে;
আমি, আনো, রুবেল মিলে
গেলাম ক্ষেতের কিনারে ।

ক্ষেত জুড়ে যে বেড়া ছিল
তার মাঝেও ফাক ছিল,
ফাঁকাগুলো কাঁটা দিয়ে
আটকে মালিক রাখছিল ।
হাতড়িয়ে সেই কাটাগুলো
সরিয়ে কেবল ঢুকছি,
ক্ষেতে ঢুকে ফুলের গায়ে
হাতটা কেবল রাখছি ।

অমনি শুনি ফিসফিসিয়ে
কারা যেন আসছে,
কেউ মনে হয় বলছে কথা
কেউবা আবার কাশছে ।

মনে হল লাঠি নিয়ে
বাগান-মালিক আসছে,
মার খাব আর বলবে সবাই
দ্যাখ চোরারা ফাসছে ।
অমনি ভয়ে ভোঁ দৌড় দিলাম
বেড়া-কাটা ডিঙিয়ে,
অন্ধকারে নাগাল পেলে
ফেলবে মেরে ঠেঙিয়ে ।

পিছন হতে জাহর দিল,
"ধর-ধর-ধর ফুলচোর---"
উঠে পড়ে দৌড়াই আবার
বাড়িয়ে যত গায়রে জোর ।

দূরে আরেক ক্ষেতের বেড়ায়
পড়ি দুজন একসাথে,
ফাটল কোথাও কাটল কোথাও
ঢুকল কাটা পায়-হাতে ।

ব্যথা যতই হোক না কেন
সহ্য করি মুখ বুজে,
রুবেল কোথায় হারিয়ে গেল
পাইনা তাকে আর খুজে ।
চিন্তা তখন অনেক বেশী
রুবেল যদি ধরা খায়,
চুরির কথা ছড়িয়ে যাবে
আজকে রাতেই সারা গায় ।

হঠাৎ শুনি চাপা স্বরে
রুবেল যেন ডাকছে,
শহর হতে আসা রুবেল,
ভুতের মতো লাগছে ।
দৌয়ে কাছে গিয়ে বলি,
"এই রুবেল তোর খবর কী?"
রুবেল বলে,"এই ব্যাটারা,
খুড়ছিস আগে কবর কি ?
আছাড় পাছাড় খাইছি যত
মরন বুঝি দূরে নাই,
এমন গজব এই জীবনে
আর কখনও দেখি নাই ।"

তারপরে সেই অন্ধকারে
অনেক দূরের পথ ঘুরে
বাড়ী এসে শুয়ে পড়ি,
ঘুম এলোনা রাত জুড়ে।

ভোর হতেই স্কুলে যাই
শূন্য হাতে, ফুল ছাড়া
ভাষার জন্য এমন দিনে
হয়েছিলাম ভাই-হারা ।

ফুটলে আলো দেখি গায়ে
লেপ্টে আছে রক্ত,
এর বেশী আর শহীদ ভাইদের
কে আছ বল ভক্ত?
শুনছি পরে সেদিন রাতে
করছে যারা তাড়া,
তারা সবাই সাত ক্লাশের
বাড়িও ওই পাড়া ।
লক্ষ্য তাদের একই ছিল
করবে তারা ফুল চুরি,
শহীদ মিনার ঢাকতে ফুলে
চোরের উপর বাটপারি ।

লেখক : জেলা আনসার কমান্ড্যান্ট, ফরিদপুর

চাতক

গোপী নাথ ঘোষ

তুমি পাখি নাকি অমরাত্মা,
তুমি নশ্বর নাকি অবিনশ্বর,
তুমি ক্ষণস্থায়ী নাকি চিরস্থায়ী?

হে মহাত্মা,
তোমার গানে মুগ্ধ হয়ে অথৈ জলে ডুবি
তোমার গানে সপ্তজমিন ঘুরে ঘুরে ফিরি।
তোমার গান উদাস করে
উদাস হাওয়ার বনে।
উদাস হয়ে থাকি আমি
উদাস তোমার পানে।

জানি এ প্রাণ নশ্বর,
তবুও কি অবিনশ্বরতা দান করে যাও তুমি!
তোমার গানেই চাতক হয়ে
পূব আকাশে উড়ি।
অতীত যত কষ্ট আছে
কষ্ট হয়েছে ম্লান ।
তোমার কাছে ফিরে আসি
ভালবাসার টান।

তোমার গানে পাতা দোলে
দোলে আঁখির পাতা,
হৃদয় আমার দোলে তোমায়
স্বপন মধুয় ঘেরা।

জানি, এ সময়ের খেলা
দুঃখ কষ্টের বেলা
ম্লান হয়ে যাবে সব।
তোমার কোন ম্লান হবে না
হে পূব আকাশের গান।
পাখির কণ্ঠে উদিত হয়েছো
তাইতো হানো বাণ।তাইতো হানো বাণ।

বর্শার ফলায় বিদ্ধ করো
নয়তো ডুবাও সাগরে,
ডুবাও আমায় তোমার প্রেমে
উষ্ণ ধারার প্লাবনে।

আমার যত কষ্ট,যত ব্যাথার গান,
ম্লান হয়েছে সব,
হে পূব আকাশের প্রাণ।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ

ফিরে যাওয়ার গান

ডা. মধুসূদন মন্ডল

স্বস্তি যেনো আমার না দেখা সেই বক ফুল।
ঈষৎ আলোকচ্ছটা ব্যাপিয়া জীবন,আর যেনো পুরাটাই আলোকবর্ষ ভূল।
হে বক ফুল! প্রিয় ফুল! প্রিয় শুভ্র-ধবল।
উষর-লগন ভেদি ভাঙ্গি ঘুম যবে।
চেয়েছি হেরিবারে, প্রস্ফূটিত হে ! তীক্ষ্ণ মগডালে,
সুশোভিত কলেবরে, আমার স্বপ্নেরও উপরে।

এরপর রোজ সে শেষ প্রহর রাতে,
ঢুলু ঢুলু চোখে বসি,অস্বচ্ছ প্রিজমে,
দেখিবার সাধ নিয়ে তিয়াসী হৃদয়
তবুও হয় নি দেখা অবোধিত তোমায়!
নৈঋত সুরভিত শ্বাশত শয্যায়,হে দুরন্ত সুন্দর!
ভরে নিকো এতটুকু এই আমূঢ় অন্তর।

মানব এমনই বুঝি,চিরায়ত ভবে,
প্রিয় রে চেয়েছে সে প্রিয়তম রূপে।
জোছনা বিলায়ে চাঁদ ক্লান্ত কলেবরে,
অতিক্রান্ত মহাকাল,মানবের তরে,
তবুও মাগিছে দেখো কেবলি পূর্ণিমা
উপেক্ষিয়া শশধরে অবোধ বালিকা।

বন্ধু তাহলে বলি!
আলেয়া আরাধ্য মোর, চিরদিন ধরি।
পদপৃষ্টে অবহেলে মানব সন্তানে,
নিরন্তর আঁখি পাতি, সুনীল শিখরে
জানিতে চাহি নি কভু, মৃত্তিকা সলিলে।

সুউচ্চ হিমাদ্রী দেখো ক্রন্দিয়া লুটাইছে,
অঝোরে ঝর্ণাধারা মাটিতে মিশিছে।
এখানে মাটির রস, মমতায় চুমাচুমি
কে তুমি হানিতেছো, হা-মরি আমি আমি।
কেহ নহে কারো আন, গৌরবে বলবান
চাওয়া-পাওয়া সমতায়, দিনান্তের সমহারে
মাটির মাতৃক্রোড়ে, শেষ হবে সাড়ে-তিনে।
বে-কারা সূচনা যেমন, বে-কারা সমাপনে,
বিলিয়ে দাও হে প্রিয়, মানবের কল্যাণে।

Poems

Meherunnessa Shapla

OUTBURST OF PASSION

passion soaring up
And dissipating in the sky
Then starts floating like cloud
Haply it becomes cloudburst
And hits me with a mighty splash

LAMENTATION

Life proceeds.....
But it has been clouded and enveloped with darkness.
There is an ocean of darkness.
I have drowned there,
Calling ,shouting,yelling to be survived,
But nobody can hear me.
I want to be flooded with effulgence
Give me light, ray and life.

FRAGRANCE OF MEMORIES

I felt a sweet bump in my heart
But could not grasp what's this?
My heart started bouncing ,
My eyes started sparkling .
Strangely , nature around me started flickering.
But what was this? I was thinking.
Though it was so kinky,
Could give me satiety
And I was deluged with gaiety.
Escaping from the past sorrows for trice ,
I could recollect all my sweet memories.

Writer: Assistant Professor, Narayanganj Govt. Mohila College

I Am No Stranger

(Poet Ahsan Habib's Ami Kono Agontuk Noi – Translated by Noor-E-Alam)

Stars in the sky are witnesses
Witnesses are the flowers of this soil,
All the glow-worms in the clump of bamboos at night
Witness in this wood tree, this star-apple
The pond in the east, the still view of the bunch of figs.
The King fisher Knows me
I am no visitor
By God I swear I am no foreign traveller
I am no stranger
I was here, by a dream rule
It is here where I remain
And being here is being everywhere-
In the whole land.

I am no stranger
In this hot sun, wet air, cloudy and weary afternoon
The birds know me
They know I am no relation of them.
The paddy shoots of kartika bear witness
Witness is in the translucent dews
Of the cherry leaves, in the canopy of moonlight
Upon the shade of Nishinda.

Kadam Aali bent by premature senility
With the darkness of his weary eyes
I know him; I am his always familiar relation.

Kadam Aali bent by premature senility
With the darkness of his weary eyes
I know him; I am his always familiar relation.

I know all about
The all empty kitchen, dry plates
Of Zamila's mother
She knows me.

Keep your hands on oar and plough, see
How deeply my hands touch those, get
My smell in the soil, my body
Bears the flavour of this tender soil.

Believe me, I am no stranger.

Paddy fields on both sides
Narrow path
Desolate river banks ahead
Embedded in my existence. Of this lost river
I, a foolish boy, am enamoured.

Writer : Assistant Prof., Dept. of English, Govt. Edward College, Pabna

ফটো গ্যালারি

৭ম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে শিশুদের সরব উপস্থিতি

দ্বৈত গানে গায়কের ভূমিকায় দুই ক্যাডার সদস্য

৭ম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের সাথে আটাশের বন্ধুরা

অষ্টাবিংশের সংহতি'র প্রথম সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন

৭ম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

৭ম বর্ষপূর্তির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বন্ধুরা

আলোকচিত্রে আটাশ

আলাপচারিতায় আটাশের বন্ধুরা

৮ম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি সভাতে বন্ধুরা

৮ম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি সভাতে বন্ধুরা

শিশুদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

পৌষের পিঠা উৎসবে আটাশের বন্ধুরা

সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে আটাশের বন্ধুরা

শিখা চিরন্তনে আটাশের বন্ধুরা

সাধারণ সভায় আটাশের বন্ধুরা

ইফতার অনুষ্ঠানে বন্ধুরা

প্রেসের কাজে ব্যস্ত আটাশের বন্ধুরা

গাজীপুর আনসার একাডেমিতে বার্ষিক বনভোজনে আটাশ এর বন্ধুরা

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

যাদের ঐকান্তিক ভালোবাসা, অকৃতিম আন্তরিকতা, উদার মানসিকতা ২৮তম বিসিএস ফোরামের স্মরণিকা অষ্টাবিংশের সংহতি দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ এবং আটাশের ৮ম বর্ষপূতি অনুষ্ঠানকে বর্ণিল ও স্বার্থক করে তুলেছে তাঁদের প্রতি নিরন্তর শুভেচ্ছা ও বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

Japan Garden City
EBL Securities Ltd.
Mir Ceramics
BBS Cables
Desh Group
Standard Bank Ltd.
Master Builders
Masud Group
Aros Trading
Summit Communications
Paragon Ceramics
Gulshan Sppining Mill
Tracer BD
Mousumi Industries
Opsonin
Bengal Biscuits
Khulna WASA
Agrani Bank Limited
ARENA Multimedia
Etihad Cardo
Gemcon
Choa Agro
Air Trip

Cute

ভেষজ নির্যাসে
মজবুত ও উজ্জ্বল দাঁতের ভিত্তি

পুদিনা ও লবঙ্গ এর এন্টিসেপটিক প্রপার্টি মাড়ি ব্যাথা ও দাঁতের ক্ষয় রোধ করে, দেয় উজ্জ্বল সাদা দাঁত এবং সজীব প্রানবন্ত নিঃশ্বাস।

Herbal Active

অরেঞ্জ কেক
বিস্কুট
Glory of 30 Years
Bengal
Orange Cake
Biscuits
Orange Cake
www.bengalbiscuits.com
Bengal Biscuits Limited

৮ম বর্ষপূর্তিতে
২৮তম বিসিএস ফোরামের
সকল সম্মানিত সদস্যদের
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

ছোঁয়া এগ্রো প্রোডাক্টস লিমিটেড

নারায়ণপুর, কাপাসিয়া, গাজীপুর।

৮ম বর্ষপূর্তিতে
২৮তম বিসিএস ফোরামের
সকল সম্মানিত সদস্যদের
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

Agrani Bank Limited
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
Committed to Serve the Nation

We offer a full range of air freight products and services, all of which are designed to offer best in class solutions.

We take pride in our innovation and offer the latest transportation techniques & technologies, as we look to be the best air cargo logistics provider in the industry.

GSA Cargo Limited

GSA Cargo Limited, GSA for Etihad Cargo/Bangladesh
Gulshan Pink City (Level 7), 15 Gulshan Avenue
Gulshan-2, Dhaka-1212, Bangladesh
Tel: +88 02 8881811-14, Fax: +88 02 8881810

www.etihadcargo.com

live BIG

CHOOSE YOUR LUXURIOUS FLAT & COMMERCIAL SPACE

APARTMENT

- **GULSHAN**
  SIZE: 2300-4000 sft
- **DHANMONDI**
  SIZE: 3559-3750 sft
- **UTTARA**
  SIZE: 1300 sft
- **BASHUNDHARA**
  SIZE: 1900 sft
- **MIRPUR-10 (Ready)**
  SIZE: 1457 & 1536 sft
- **ZIGATOLA**
  SIZE: 1400 sft
- **BIJOY NAGAR**
  SIZE: 1400 sft

COMMERCIAL

- **MALIBAGH**
  SIZE: 1350--5357 sft
- **MIRPUR-10**
  SIZE: 992-5052 sft

017 555 84 555
017 555 84 557
017 555 84 551

GEMCON CITY LIMITED

Gemcon City Limited
House: 44, Road: 16(27 old), Dhanmondi
Dhaka-1209, Bangladesh
Web: www.gemconcity.com

ADN
Center of Excellence

ARENA
MULTIMEDIA

AN OFFBEAT CAREER TO MAKE YOU FAMOUS

Discover creative courses that will lead you to some of the most exciting career in the media & entertainment industry

RAHUL DRAVID
AMBASSADOR & MENTOR

22 Years of Experience | 20 Countries | 4.5 Lakh+ Students | 250+ Centres

Programs : Graphic Design | Animation | Gaming | Visual Effects | Film Making

Malancha Green, House#58, Road#3/A, Dhanmondi, Dhaka - 1205
Toll Free: 0800 111 4444 | IP Phone: +880 9610961 961

We provide instant world-wide air ticketing, hotel booking, holiday packages, visa assistance, airport assistance service, Umrah & Hajj package.

A 24 HRS
ONE STOP
MULTIPLE
SERVICE PROVIDER

RELIABLE MONEY EXCHANGE FACILITIES

Call Center Services

Customer care service, customer satisfaction survey, telemarketing, sales support, order fulfillment, account verification & confirmation, information validation, account maintenance & reconciliation, application processing, inquiry service, help desk, technical support & data entry service

Please contact us

IATA
এয়ার ট্রিপ ইন্টারন্যাশনাল লিঃ
Air Trip International Ltd.
(A Sister Concern of Times Group)

Head Office : City Heart (4th Floor), 67, Naya Paltan, V.I.P Road, Dhaka-1000, Phone : 9353512-5, 9352486, 9336033, Fax : 880-2-9353516, E-mail : airtrip@timesgroup.com, www.timesgroupbd.com

Gulshan Office : Navana Tower Type-C (5th Floor), 45, Gulshan Avenue, Gulshan-1 Dhaka-1212
Phone 8857545-7 (3 Lines), E-mail:timesaviation@timesgroupbd.com

টাইমস গ্রুপ TIMES GROUP

"Let's Serve You Better"

২৮তম বিসিএস ব্যাচের ৮ম বর্ষপূতিতে সকল সদস্যকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা

খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

Official Partners' of

ASTROPHYSICS™
TOMORROW'S TECHNOLOGY FOR TODAY'S SECURITY

Checkpoint Baggage Scanner Dual View Baggage Scanner Occupied Car Scanner

COMMPORT
Specializing in Security and Safety

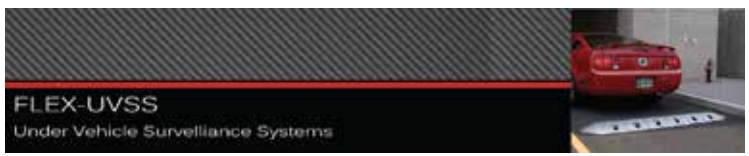

CommPort Under Vehicle Surveillance System

GARRETT
METAL DETECTORS
Authorized Distributor

Hand Held Metal Detector

33 pinpoint zones

TRACER
ELECTROCOM

House: 2/3 (Ground Floor), Block-A, Lalmatia, Mirpur Road, Dhaka-1207, Bangladesh
Tell: +88-02-9146244; 58156967-68; Email: kirashid@tracerbd.com

Gulshan Spinning Mills Ltd.

... believe in quality

Your room for cotton yarn, Pima yarn, Organic yarn & Slub yarn.

NE 20/s-NE 40/s Carded, Combed & Rotor yarn NE 6/s- NE 24/s

SAI GLOBAL Certified System ISO 9001

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex Standard 100 Test-No. 09.HBD.70531 Hohenstein

CERTIFIED TO OE 100 STANDARD

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD · GOTS ·

GET GSML GET BETTER

Ta- 50(1st Floor),Intl. Airport Road, Mohakhali C/A,Gulshan, Dhaka-1213,
Tel: 9886235, 58811577,Fax:58812735, E-mail:gulshan@gnbd.net.bd

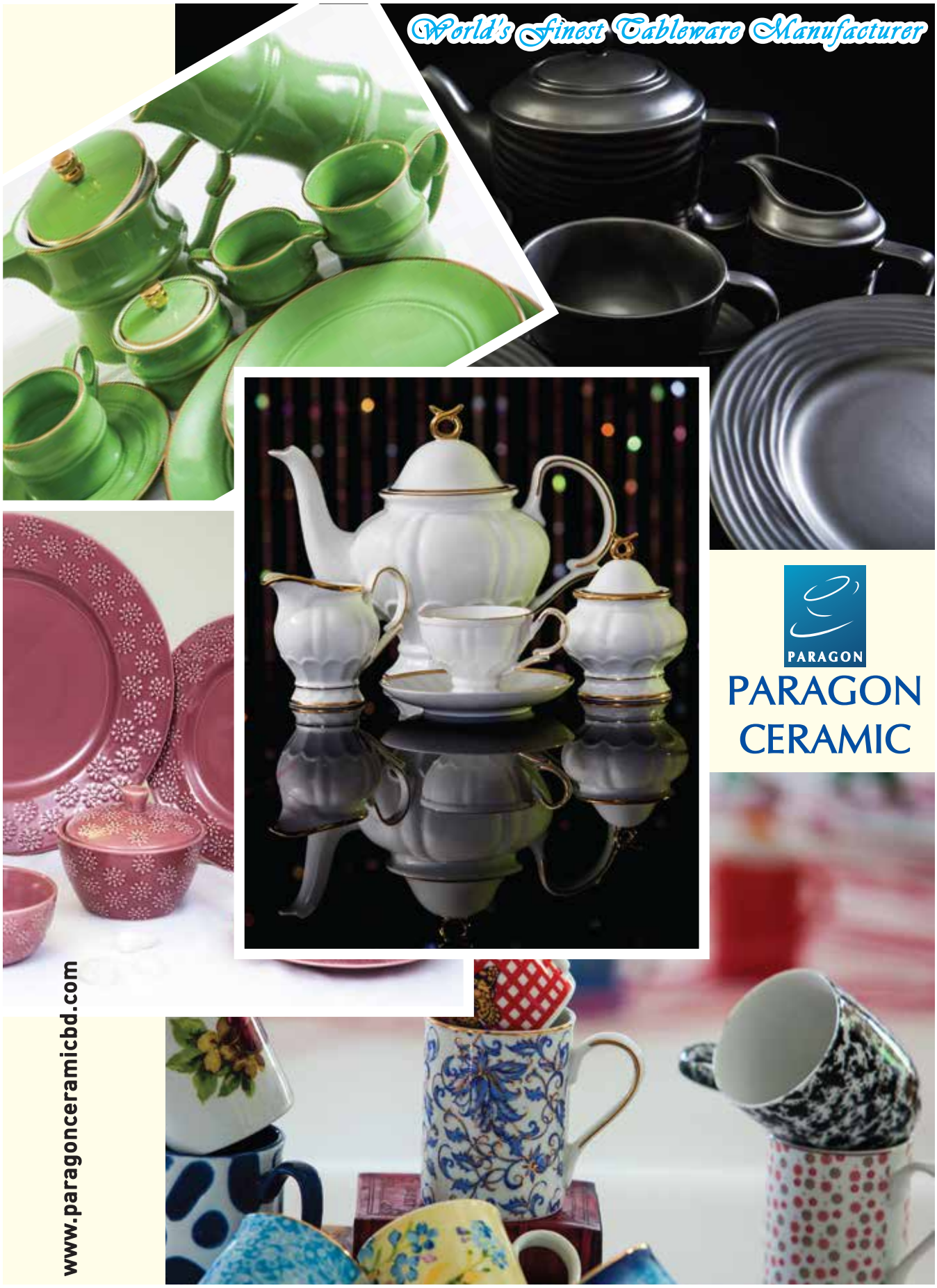

World's Finest Tableware Manufacturer
PARAGON
PARAGON
CERAMIC
www.paragonceramicbd.com

SUMMIT COMMUNICATIONS LIMITED

The fastest growing Fiber Optic Network Infrastructure of Bangladesh

01	Access to over 42,000 KM optical fiber network nationwide	42K KM+
02	World standard NOC (Network Operation Center) monitoring round the clock 24x7x365	24X7
03	Expanded our network at 64 districts and 475 Upazillas	475 Upazillas
04	1st NTTN optical fiber transmission network coverage in southern hill tract districts	1st
05	4600+ Telco 3G and 4G BTS are connected by SCL fiber	4600+ BTS
06	Ensuring at least 99.9% uptime via multiple redundant paths	99.9%
07	Served 300+ Gbps of national internet demand which is more than 35% of national demand	300+Gbps
08	Ensured 100% service and Bandwidth availability during recent all Sea-ME-WE-4 maintenance	100%
09	Served customers from closest PoP by developing 1500+ PoPs around Bangladesh where customers are getting closest serving point	1500+ PoPs

Summit Communications Limited

Working for tomorrow

18, Karwan Bazar Commercial Area, Dhaka-1205.
+880 2 8189573-5
info@summitcommunications.net

www.summitcommunications.net

Once Daily

Linadus® 5 Tablet

Linagliptin INN 5 mg

The safest DPP-4 inhibitor

- Effective for type-2 diabetic patients as mono or add-on therapy
- Safe for renal & hepatic impaired patients without dose adjustment
- Convenient once daily dose at reasonable price

Vildamet®

50/500
50/850 Tablet

Vildagliptin INN + Metformin Hydrochloride BP

The novel combination therapy to achieve glycemic target

- Reaches glycemic target effectively compared to Metformin monotherapy
- Prevents progressive loss of beta cell function
- Does not show weight gain
- No risk of hypoglycemia

FURTHER INFORMATION IS AVAILABLE FROM:
Opsonin Pharma Limited
Product Management Department, Opsonin Building
30 New Eskaton, Dhaka 1000, Visit our website: www.opsonin.com

"Like" us on
facebook
.com/OpsoninPharma

Opsonin
Opsonin Pharma
Ideas for healthcare

AROS TRADING
Food Zone
ops@aros.com.bd
+8801755558870
AROS
Juices
AROS
Soup
AROS

Best Wishes

K. M Masudur Rahman
Managing Director

Masud Steel
Design BD. Ltd.

Total Solution of Steel Structural Building and API Standard Pipe

Masud Steel Design BD. Ltd.

Head Office: House # 26 (4th Floor), Road: Garibe-E-Newaz Avenue, Sector # 13, Uttara, Dhaka-1230, Bangladesh.
Phone: +88-02-48954127, +88-02-55085861, +88-02-55085862
Fax: +88-02-8991503
www.masudgroup.com.bd

Since 1997

master BUILDER

ongoing projects:

GREEN CITY at Mirpur, Dhaka
BURJ AHMED at Natun Palton Line Azimpur, Dhaka
HAQUE PALACE at Hazaribagh, Dhaka
SHAFI TOWER at Sheikh Shaheb Bazar, Azimpur, Dhaka
HAZERA SHUKUR MONJIL at Azimpur, Dhaka
SABER VILA at Sheikh Shaheb Bazar, Dhaka
BAGANBILASH at Matikata, Dhaka Cantt., Dhaka
DAIRA COMPLEX at Azimpur, Dhaka
NAYANTARA at Matikata, Dhaka Cantt., Dhaka
ALBIN PALACE at East Kafrul, Dhaka
NILKANTHA at Azimpur, Dhaka

We have successfully handed over more than **500+** Quality Apartments

Member REHAB

Registered RAJUK

Beyond Building

Master Builder Limited

Head Office : 135 Azimpur Road, Psyche Building (Ground Floor), Dhaka - 1205, Tel: 55152021

Corporate Office : CB - 211/6 Puran Kachukhet Bazar (3rd Floor), Dhaka Cantonment
Dhaka - 1206, Tel: 8713514-16, Fax: 9871936

Email: info@masterbuilderbd.com, Web: www.masterbuilderbd.com, /masterbuilderlimited

WITH THE BEST

COMPLIMENTS

FROM

desh
group of
companies

সর্বাধিক লাভে

সুরক্ষিত হোক আপনার সঞ্চয়

ভিন্ন ভিন্ন সাতটি স্কিমে

এসবিএল এমডিএস

(মান্থলি ডিপোজিট স্কীম)

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড এর রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন সাতটি স্কিমে **"এসবিএল এমডিএস"** স্কিম। উক্ত স্কিমে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশাজীবী বাংলাদেশী নাগরিকগণ ০৩ (তিন) বছর থেকে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বছর মেয়াদে বিভিন্ন প্রকল্পে উপভোগ করবনে আকর্ষনীয় মুনাফা। তাই আজই স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেডের **"এসবিএল এমডিএস"** স্কিমে টাকা সঞ্চয় করে ভবিষ্যতে থাকুন নিশ্চিন্তে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেডের নিকটস্থ শাখায় যোগাযোগ করুন অথবা ওয়েব সাইট ভিজিট করুন।

এমডিএস সার্বজনীন — গ্রাহক নিজ নামে অথবা যৌথ নামে ০৩ (তিন) বছর ও ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদে ৫০০ টাকা, ১০০০ টাকা, ২০০০ টাকা, ২৫০০ টাকা, ৫০০০ টাকা ও ১০,০০০ টাকা জমা করে এই সঞ্চয় প্রকল্প খুলতে পারবেন

এমডিএস প্রজন্ম — ১৮ বছরের নীচে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাংলাদেশী নাগরিক অভিভাবকের সাথে যৌথ নামে ০৩ (তিন) বছর, ০৫ (পাঁচ) বছর, ৭ (সাত) বছর ও ১০ (দশ) বছর মেয়াদে ৫০০ টাকা, ১০০০ টাকা, ২০০০ টাকা, ২৫০০ টাকা, ৫০০০ টাকা ও ১০,০০০ টাকা জমা করে এই সঞ্চয় প্রকল্প খুলতে পারবেন

এমডিএস ঘরনী — ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব কোন বাংলাদেশী মহিলা নাগরিক গ্রাহক নিজ নামে ০৪ (চার) বছর ও ০৬ (ছয়) বছর মেয়াদে ৫০০ টাকা, ১০০০ টাকা, ২০০০ টাকা, ২৫০০ টাকা, ৫০০০ টাকা ও ১০,০০০ টাকা জমা করে এই সঞ্চয় প্রকল্প খুলতে পারবেন

এমডিএস বন্ধন — ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব যে কোন দৈনিক উপার্জনকারী বাংলাদেশী নাগরিক গ্রাহক নিজ নামে অথবা যৌথ নামে ০৩ (তিন) বছর ও ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদে ২০০ টাকা; ৩০০ টাকা; ৫০০ টাকা; ৭০০ টাকা; ১,০০০ টাকা জমা করে এই সঞ্চয় প্রকল্প খুলতে পারবেন

এমডিএস লাখপতি প্লাস — ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব যে কোন বাংলাদেশী নাগরিক গ্রাহক নিজ নামে অথবা যৌথ নামে ০৩ (তিন) বছর, ০৫ (পাঁচ) বছর, ৭ (সাত) বছর ও ১০ (দশ) বছর মেয়াদে ২,৫০০ টাকা; ১,৩৫০ টাকা; ৯০০ টাকা ও ৫৫০ টাকা জমা করে এই সঞ্চয় প্রকল্প খুলতে পারবেন

এমডিএস মিলেনিয়ার প্লাস — ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব যে কোন বাংলাদেশী নাগরিক গ্রাহক নিজ নামে অথবা যৌথ নামে ০৩ (তিন) বছর ও ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদে ২৪,৫০০ টাকা ও ১৩,৫০০ টাকা জমা করে এই সঞ্চয় প্রকল্প খুলতে পারবেন

এমডিএস কোটিপতি প্লাস — ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব যে কোন বাংলাদেশী নাগরিক গ্রাহক নিজ নামে অথবা যৌথ নামে ০৩ (তিন) বছর, ০৫ (পাঁচ) বছর, ৭ (সাত) বছর ও ১০ (দশ) বছর মেয়াদে ২,৪২,০০০ টাকা; ১,৩২,০০০ টাকা; ৮৯,০০০ টাকা ও ৫২,০০০ টাকা জমা করে এই সঞ্চয় প্রকল্প খুলতে পারবেন

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড

www.standardbankbd.com

mir
CEMENT

নিশ্চিন্তে নির্মাণ

Corporate Head Office: House: B-147, Road: 22,
Mohakhali DOHS, Dhaka-1206, Phone: +88-02-9889335-8,
Hotline: 09612996600, www.facebook.com/MirCement/,
Web: www.mircement.com

BBS Cables
Environment Friendly Cables

BBS CABLES®
more than safety

EMERGING TO THE
NEW HORIZON

CCV LINE FOR HIGH VOLTAGE (HV), EXTRA HIGH VOLTAGE (EHV) CABLE (UP TO 230 KV).

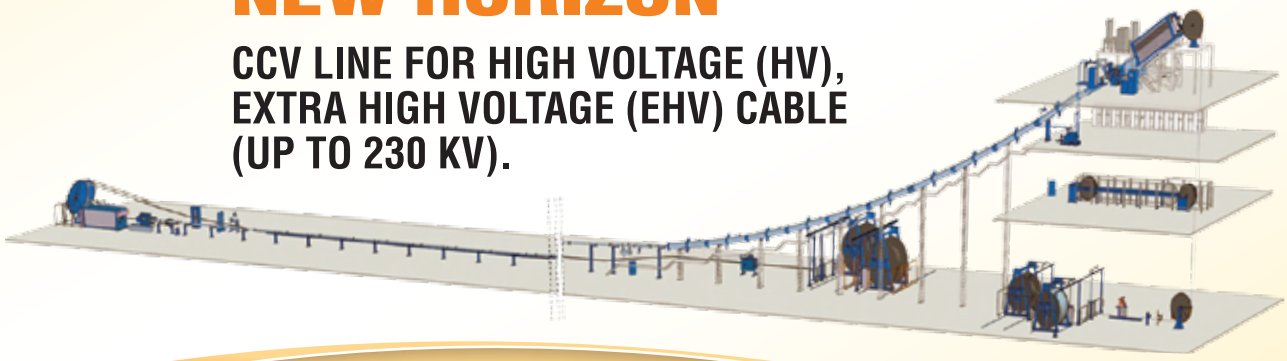

BASIC ADVANTAGE OF
CCV LINE

- THIS CCV LINE IS FROM (TROESTER, GERMANY) OF WHICH PRODUCTION CAPACITY IS UP TO 230KV.
- LONG PRODUCTION LENGTH.
- PERFECT CONCENTRICITY AND ROUNDNESS THROUGH TWNROT AND TROSS.
- EXCELLENT CORE TOLERANCE FOR HV/EHV/MV CABLES.
- EXTRUDER CONTROL IS VIA MODULAR AUTOMATION SYSTEM.
- COMPUTER DISTRIBUTION FLOW CHANNEL.
- COMPUTER OPTIMIZED MATERIAL FLOW CHANNELS.
- TYPICALLY THE LINE CONTROL CONSISTS OF PLC-PC ARCHITECTURE.

01755597727 www.bbscables.com.bd / bbscables

JAPAN GARDEN CITY LTD.

With the Best Compliments of

Yearly Celebration 2019

28th BCS FORUM

Title Sponsor :

JAPAN GARDEN CITY LTD.

Japan Garden City Ltd.

JAPAN GARDEN CITY LTD.
Corporate Office :
24/A, Tajmahal Road (Ring Road), Block-C, Mohammadpur, Dhaka-1207
Tel : +88 02 8105631, 8101084-5, Fax : +88 02 8101480
e-mail : mwahiduzzaman@gmail.com, jgcibdsl@yahoo.com
jgcibdor@yahoo.com, web : www.jgcibd.com, www.jgci.info

HOTLINE
01819 212939
01817 031732
01817 031733
01817 031730

design by : RYAN MULTIMEDIA